অধিকারহারা জনগণের মুখপত্র

# জাতীয় বার্তা

সত্য অন্বেষণে নিবেদিত

১ম বর্ষ ॥ ৭ম সংখ্যা ॥ ১৯ আগষ্ট ২০১০ ॥ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ ॥ শুভেচ্ছা মূল্য: ১০ টকা
email: jatyabarta.jumma@gmail.com

### সওয়াল জবাব

"পাহাড়িদের মধ্যে বাঙালি বসতি গড়ে তোলার কারণেই এসব সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। এখন অভিবাসী বাঙালিদের সরানোও যাচ্ছে না। তাই ভূমি জরিপের মাধ্যমে পাহাড়িদের জমি ভাগ করে দিতে হবে।" - ঢাকায় ৭ আগষ্ট 'আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভূমি অধিকার ও উন্নয়ন' শীর্ষক আলোচনা সভায় সাজেদা চৌধুরী। [কালের কণ্ঠ, ৮ আগষ্ট ২০১০]

*- স্বীকার করছেন পাহাড়িদের জমিতে বাঙালিদের বসিয়ে দেয়ায় সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। অথচ বাঙালিদের সরিয়ে নিয়ে সমস্যার সমাধান করতে চাইছেন না। ... তাহলে ভূমি জরিপের আসল উদ্দেশ্যও বোঝা গেল!*

## অবিলম্বে ধরপাকড়, নিপীড়ন বন্ধ করুন: ইউপিডিএফ

রাঙামাটি প্রতিনিধি: রাজনৈতিক কারণে ইউপিডিএফ-এর কর্মী সমর্থকদের ওপর নিপীড়নের প্রতিবাদ ও নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরতে ১১ জুলাই রাঙামাটির কুদুকছড়িস্থ ইউপিডিএফ কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা হয়। এতে ইউপিডিএফ নেতা ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সদস্য সচিব মাইকেল চাকমা সাংবাদিকদের সামনে লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান।

তিনি বলেন, মূলতঃ সাম্প্রতিক সময়ে রাঙামাটি জেলার বিভিন্ন স্থানে ইউপিডিএফ-এর কর্মী ও সমর্থকদের ওপর যে দমন পীড়ন চলছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরার জন্য সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সদস্য সচিব মাইকেল চাকমা

লিখিত বক্তব্যে তিনি আরো বলেন, "একটি গণতান্ত্রিক দল হিসেবে ইউপিডিএফ পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গত সাড়ে এগার বছর ধরে শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিকভাবে সংগ্রাম চালিয়ে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের লাঞ্ছিত দুঃখী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সারা দেশের আপামর জনসাধারণের ভাগ্য পরিবর্তনের লড়াইয়েও আমাদের পার্টি নিবেদিত। জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল-এর সাথেও আমরা যুক্ত। প্যালেস্টাইন, আফগানিস্তানসহ বিশ্বের যেখানে মানবতা বিরোধী নিপীড়ন-নির্যাতন সংঘটিত হয়েছে আমাদের পার্টি তার নিন্দা জানিয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, প্রতি পদে ও প্রত্যেক সরকারের আমলে আমাদের পার্টির ওপর নিষ্ঠুর দমন-পীড়ন চালানো হয়েছে এবং এই দমন-পীড়ন এখনও অব্যাহত আছে। সম্প্রতি সরকারের একটি গোপন দলিলে (স্মারক নং: ২০১৬/জয়েন্ট অপস(এ)/ ৭৮৭) দেখা যায়, গত ৫ মে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সশস্ত্র বাহিনীর একটি মিটিঙে "ইউপিডিএফ-এর উত্থানকে নিয়ন্ত্রণসীমার মধ্যে রাখার" সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উক্ত মিটিঙে গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ৩০ জুন রচিত এই দলিলে আরো বলা হয় যে, "ইউপিডিএফ-এর মাঠ পর্যায়ের নেতাদের নেতিবাচক কার্যক্রম বন্ধ করার লক্ষ্যে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা" এবং "ইউপিডিএফ ও অপরাপর আঞ্চলিক দলগুলোকে নিবন্ধনের আওতায় এনে আইনগত বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে চাপ সৃষ্টি করা" হবে।'

তিনি সরকারের উক্ত সিদ্ধান্তকে "অগণতান্ত্রিক ও সংবিধান পরিপন্থী" বলে মন্তব্য করেন। মাইকেল চাকমা ইউপিডিএফ-এর নেতা কর্মিদের ওপর নির্যাতনের যে বর্ণনা দেন তা নীচে তুলে ধরা হল।

**ক. শারীরিক নির্যাতন ও গ্রেফতার:**

১। গত ২২ জুন বিকেল ৩:৩০টায় রাঙামাটি শহরের অনতিদূরে দিঘেলিবাগ নামক এলাকা থেকে ইউপিডিএফ সদস্য শিশু মনি চাকমাকে সাদা পোষাকধারী সেনা সদস্যরা আটক করে। কিন্তু পত্রিকায় তাকে ২৪ তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টায় আটক করা হয়েছে বলে প্রচার করা হয়। আটকের পর শিশু মনি চাকমার ওপর অমানুষিক শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়। মুমূর্ষু অবস্থায় সেনা কর্তৃপক্ষ তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে। তার কাছ থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ পাওয়ার তথ্যও ভিত্তিহীন।

২। গত ২৬ জুন শনিবার ভোর ৪টার দিকে রাঙামাটি সদর উপজেলাধীন বালুখালি ইউনিয়নের মাস্টার পাড়া গ্রাম থেকে সেনাবাহিনী দুই ২য় পাতায় দেখুন

## সংবিধান সংশোধনী কমিটির কাছে ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর দাবি (খসড়া)

**[পার্বত্য চট্টগ্রামের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল ইউপিডিএফ সংবিধান সংশোধনী কমিটির কাছে পেশ করার জন্য দাবিনামা প্রণয়ন করেছে। পার্টি দাবিগুলো খসড়া আকারে প্রচার করেছে ও জনগণের পক্ষ থেকে মতামত সংগ্রহ করছে। এই মতামতের ভিত্তিতে দাবিনামা চূড়ান্ত করবে ইপিডিএফ। আমরা বহুল প্রচারের জন্য এই খসড়া দাবিনামা হুবহু ছাপালাম।]**

১। "নবম-খ ভাগ" নামে একটি বিভাগ সংযোজন করা, যার শিরোনাম হবে "ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অধিকার সম্পর্কিত বিধানাবলী" এবং এই ভাগের অধীনে ১৪১ঘ অনুচ্ছেদ যোগ করে নিম্নোক্ত বিধান সন্নিবেশিত করা:

"৯ম খ ভাগ

ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অধিকার সম্পর্কিত বিধানাবলী

১৪১ঘ। (১) দেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগণের সার্বিক উন্নতিকল্পে তথা তাহাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, কৃষ্টি ও ধর্মীয় বিশ্বাস সংরক্ষণ ও বিকাশের স্বার্থে দেশের কোন বিশেষ এলাকাকে "স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল" বলিয়া ঘোষণা করা যাইবে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম হইবে এ ধরনের একটি "স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল"।

(২) সরকার স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে আইনের দ্বারা পরিচালিত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা গঠন করিতে পারিবে, যা ঐ অঞ্চলে বসবাসরত স্থায়ী বাসিন্দাদের দ্বারা নির্বাচিত হইবে এবং, এই সংবিধানের তৃতীয় ভাগে যাহাই বলা হউক না কেন, এইরূপ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে নাগরিকদের চলাফেরা, যাতায়াত ও বসতিস্থাপন নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

(৩) স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে বসবাসরত জনগণ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রয়োগ করিবেন।

(৪) দেশ রক্ষা, পররাষ্ট্র, মুদ্রা ও ভারী শিল্প ব্যতীত রাষ্ট্র পরিচালনার বাকি সমুদয় বিষয় পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার হাতে ন্যস্ত থাকিবে।

(৫) দেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগণের নিজস্ব প্রথাগত ভূমি ও অন্যান্য অধিকার সংরক্ষিত থাকিবে; স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে বসবাসরত স্থায়ী বাসিন্দা ব্যতিত অন্য কাহারো নিকট জমি বিক্রয়, বন্দোবস্তি, ইজারা বা অন্য কোন উপায়ে হস্তান্তর কিংবা তাহাদের প্রকাশ্য সম্মতি ব্যতিত সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা যাইবে না।

(৬) এই ভাগে বর্ণিত অধিকার ক্ষুণ্ন হয় এমন কোন আইন সংসদে উত্থাপনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জনগণের মতামত, প্রয়োজনবোধে গণভোটের মাধ্যমে, গ্রহণ করিতে হইবে।

(৭) সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে যাহা বলা হউক না কেন, এই ভাগের কোন বিধান সংশোধনের (সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণ) ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের সম্মতির প্রয়োজন হইবে।"

**ব্যাখ্যা:** বাংলাদেশে আনুমানিক ৪৫টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বসবাস। তারা যুগ যুগ ধরে অবহেলিত, শোষিত, বঞ্চিত ও নির্যাতিত। স্বাধীনতার পর রচিত সংবিধানে তাদের স্বাতন্ত্র্য সত্তাকে স্বীকার করা হয়নি। ফলে কোন সরকার তাদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। জাতিসংঘ সনদে ছোট-বড় প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকে স্বীকার করা হয়েছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সম্প্রতি আদিবাসী ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অধিকার বিষয়ক ঘোষণা অনুমোদিত হয়েছে। বিশ্বের বহু সরকার তাদের দেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র জাতিসমূহের ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে স্বীকার করে নিয়েছে ও তাদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অস্ট্রেলিয়া সরকার তাদের দেশে তাদেরই পূর্বপুরুষদের দ্বারা অতীতে ক্ষুদ্র জাতিগুলোর ওপর নির্যাতন চালানোর জন্য ক্ষমা চেয়েছে।

বাংলাদেশেও ক্ষুদ্র জাতিগুলোর অস্তিত্ব ও অধিকার মেনে নিয়ে সংবিধানে বিশেষ বিধান সংযোজন করা এখন সময়ের দাবি। দেশে সকল জাতির ও সকল ২য় পাতায় দেখুন

## জবাব দে সন্তু লারমা

গত ৭ আগষ্ট ঢাকায় এলজিইডি অডিটোরিয়ামে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খাদ্য মন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক, চাকমা রাজা দেবাশীষ রায়, জনসংহতি সমিতির সন্তু গ্রুপের সভাপতি সন্তু লারমা ও সংসদ উপনেতা ও পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী।

এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফরম এন্ড ডেভেলপমেন্ট ও বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম যৌথভাবে দিনব্যাপী উক্ত আলোচনার আয়োজন করে। উদ্বোধনী সভায় বক্তব্যের এক পর্যায়ে সাজেদা চৌধুরী বলেন, পার্বত্য জেলাগুলো থেকে সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয় সন্তু লারমার অনুরোধে। ইংরেজি দৈনিক নিউ এজ সাজেদার এই বক্তব্য সংক্ষিপ্তাকারে পরদিন ছাপায়। তাতে লেখা হয়: "On withdrawal of troops from the hills, Sajeda said the decision to pull ২য় পাতায় দেখুন

### সময়ের গল্প

অজল চাকমা
ajolchakma@gmail.com

জুম্ম যদি দুঃখিনী মা হয়
সন্তু লারমা তার ক্ষতস্থান -
মরণব্যাধি গ্যাংগ্রীন।

কিলবিল করছে সেথায়-
ওয়েচিং, ইনু, চৈতালি,
কিংবা মুনি বা খুশি এবং আরও।

ক্ষতস্থান হতে রক্ত পানে যাপিত হয়
সুযোগ সন্ধানী মাছিদের জীবন।
তাহলে বলি শোন,
এরা আর কেও নন,
আজন্ম ভিখারী উদ্বাস্তন
আর তার সাঙ্গ-পাঙ্গ যারা এখন।

**[জাতীয় বার্তা কবিতা ছাপানোর জন্য উপযুক্ত স্থান নয়। তবুও ইমেইলে পাওয়া এই কবিতাটির সময়োপযোগীতা বিবেচনা করে ছেপে দেয়া হলো। - সম্পাদক]**

## পানছড়িতে নতুন করে ভূমি বেদখলের পাঁয়তারা

**॥ পানছড়ি প্রতিনিধি ॥**

খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলার ছোট পানছড়ি, মরাটিলা ও শান্তিপুর এলাকায় নতুন করে সরকার ও সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় অনুপ্রবেশকারী বাঙালীরা নতুন করে পাহাড়িদের জায়গা-জমি বেদখল করার পাঁয়তারা চালাচ্ছে। কয়েকদিন আগে কিছু বাঙালীকে পাহাড়ি এলাকায় ম্যাপসিট নিয়ে ঘুরাঘুরি করতে দেখা যায় এবং পাহাড়িদের জায়গা জমি নিজেদের বলে দাবি করতে শোনা গেছে।

৭৯-৮০ সালে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথাগত আইনকে পাশ কাটিয়ে হেডম্যানের প্রতিবেদন ছাড়া একতরফাভাবে গোপনে পাহাড়িদের জায়গাগুলি বাঙালীদের কাছে বন্টন করে দেয়। তারই ধারাবাহিকতায় ২০০১ সাল হতে ২৪৫ নং বড় পানছড়ি মৌজার মদন পাড়ার রঞ্জ জ্যোতি ত্রিপুরা, অলকা রঞ্জন ত্রিপুরা, কলিকা রঞ্জন ত্রিপুরা, জ্যোতিকা রঞ্জন ত্রিপুরা, ২য় পাতায় দেখুন

## সংবিধান সংশোধনী কমিটির

১ম পাতার পর

সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য, সৌভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যের বন্ধন গড়ে তোলার জন্য এ ছাড়া কোন বিকল্প নেই। ক্ষুদ্র জাতিগুলোকে পশ্চাদপদ রেখে একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশ কখনোই এগিয়ে যেতে পারবে না। ক্ষুদ্র জাতিগুলোর ওপর নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা জারী রেখে দেশে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হতে পারে না।

২। প্রথম ভাগে ২ক অনুচ্ছেদ (প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাইবে) বাদ দেয়া।

**ব্যাখ্যাঃ** ১৯৮৮ সালে অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের আমলে এই অনুচ্ছেদ সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তখন আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ প্রায় সকল রাজনৈতিক দল এর বিরোধীতা করেছিল। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, পরে এরশাদের পতনের পর এই দুই দল পর্যায়ক্রমে ক্ষমতায় আসীন হলেও তারা এই অনুচ্ছেদ বাতিল করেনি।

এই অনুচ্ছেদ রাষ্ট্রের ধর্ম নিরপেক্ষ চরিত্রের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র মানেই ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র, অর্থাৎ এখানে রাষ্ট্রীয় কাজ কারবার থেকে ধর্মকে আলাদা করা হয়। তবে তার মানে এই নয় যে, যারা রাষ্ট্রে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবেন তারা নিজ নিজ ধর্মমত পালন করতে পারবেন না।

৩। প্রথম ভাগে ৬(২) অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপনঃ "বাংলাদেশে বসবাসরত বাঙালি, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, বম, মুরুং, গারো, মুনিপুরী ও সাঁওতালসহ ৫ম তফসিলে [এরপর ৫ম তফসিল নামে একটি তফসিল সংযোজিত করা, যেখানে অন্যান্য জাতিসত্তার নাম সন্নিবেশিত হবে] বর্ণিত বিভিন্ন জাতিসত্তার জনগণ নাগরিকত্ব বিচারে বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন।"

**ব্যাখ্যাঃ** বাংলাদেশ বহুজাতিক ও বহুভাষিক দেশ। এখানে বাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি হলেও অন্যান্য জাতির জনগণও স্মরণাতীতকাল থেকে বসবাস করে আসছেন। দেশে বসবাসরত সকল জাতির মধ্যে সমমর্যাদা ও সমঅধিকারের ভিত্তিতে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধানে তাদের স্বীকৃতি একান্ত প্রয়োজন। তাদের জাতিগত পরিচয় ভিন্ন হতে পারে, তবে তারা সবাই বাংলাদেশী নাগরিক।

৪। দ্বিতীয় ভাগের ১৩ অনুচ্ছেদের (গ) দফার পর "ঘ" দফা সংযোজিত করা, যাতে থাকবেঃ "যৌথ মালিকানা, অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র জাতিসত্তার প্রথাগত মলিকানা।"

**ব্যাখ্যাঃ** বর্তমান সংবিধানে কেবল তিন ধরনের মালিকানা স্বীকৃত। ক্ষুদ্র জাতিসমূহের যুগ যুগ ধরে চলে আসা প্রথাগত যৌথ মালিকানারও স্বীকৃতি প্রয়োজন। এই ধরনের মালিকানার স্বীকৃতি না থাকার কারণে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগণের জমিজমা বহিরাগতদের দ্বারা প্রতিনিয়ত বেদখল হয়ে যাচ্ছে।

৫। তৃতীয় ভাগের ২৮ নং অনুচ্ছেদের দফা (৪) এ "নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য" শব্দসমূহের পর নিম্নোক্ত শব্দসমূহ সংযোজন করাঃ "কিংবা ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগণের সার্বিক উন্নয়নকল্পে"।

**ব্যাখ্যাঃ** ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগণের স্বার্থে বিধি বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক বাধা দূর করার জন্য এর সংযোজন প্রয়োজন।

৬। পঞ্চম ভাগে ৬৫ নং অনুচ্ছেদের (২) দফার পর "২ক" দফা সংযোজনঃ "পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি সংসদীয় আসন (খাগড়াছড়ি - ২৯৮, রাঙ্গামাটি -২৯৯ ও বান্দরবান - ৩০০) ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগণের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে।"

**ব্যাখ্যাঃ** জাতীয় সংসদে পার্বত্য চট্টগ্রামের পশ্চাদপদ পাহাড়ি জনগণের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য এই ধরনের বিধান অপরিহার্য।

৭। ৫ম ভাগের ১ম পরিচ্ছেদের ৭০ নং অনুচ্ছেদ বাদ দেয়া অথবা সংসদে সংসদ সদস্যগণের স্বাধীনভাবে ভোট দেয়ার বা ভোট দানে বিরত থাকার বিধান রেখে সংশোধন করা। [এই অনুচ্ছেদ দ্বারা সংসদ সদস্যগণের ফ্লোর ক্রসিং নিষিদ্ধ করা হয়েছে]

**ব্যাখ্যাঃ** এই বিধান অগণতান্ত্রিক, সংসদের জন্য অমর্যাদাকর এবং সংসদ সদস্যদের অধিকার ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করে।

৮। নবম-ক ভাগের ১৪১ক, ১৪১খ ও ১৪১গ অনুচ্ছেদ বাদ দেয়া। [জরুরী অবস্থা জারীর ক্ষমতা]

**ব্যাখ্যাঃ** জরুরী অবস্থা জারির বিধান গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই বিধান থাকা উচিত নয়।

---

**ইউপিডিএফ কর্তৃক রচিত খসড়া দাবির ওপর আপনার মতামত দিন। ইউপিডিএফ কার্যালয়, বনির্ভর বাজার, খাগড়াছড়ি। ফোনঃ ০৩৭১-৬১৩৩২, মোবাইলঃ ০১১৯০৩৫৯১৪১ ইমেলইঃ** updfcht@yahoo.com

## পানছড়িতে নতুন করে ভূমি

১ম পাতার পর

বীর বাহু ত্রিপুরা, ছন্দ জীবন ত্রিপুরা ও পুষ্প রঞ্জন ত্রিপুরা -- এদের প্রত্যেকের ৫.০০ (পাঁচ) একর করে জায়গা অনুপ্রবেশকারী বাঙালীরা বেদখল করে। বেদখলকারীরা হলো ১. দুলাল মিঞা, পীং-মসজিদ মিঞা, সাং-মোহাম্মদপুর, ২. মসজিদ মিঞা, পীং-অজ্ঞাত, সাং- মোহাম্মদপুর, ৩. গণি মিঞা, পীং- অজ্ঞাত, সাং- মোহাম্মদপুর, ৪. সাত্তার মিঞা, পীং- অজ্ঞাত, সাং- মোহাম্মদপুর বেদখল করে ভোগদখল করে আসছে। এভাবে মোট ৭৬ বাঙালী পরিবারের জন্য প্রত্যেক পরিবারকে ৫.০০ একর করে পাহাড়িদের প্রায় ৪,০০০ (চার হাজার) একর জায়গা বেদখলের পায়তারা চলছে।

শুধু দখলীয় জায়গা নয়, সরকারী বন্দোবস্তিকৃত জমিও প্রশাসনের নাকের ডগায় বেদখল করা হচ্ছে। যেমন, গত জরুরী অবস্থার সময় তৎকালীন পানছড়ি জোনের মেজর নাসিমের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় "উপজাতীয় সাংস্কৃতিক সংঘের" ০.৪০ (চল্লিশ) শতক জায়গা পানছড়ি বাজারের সিরাজ চেয়ারম্যান বেদখল করে। একইভাবে একই এলাকায় অমলেন্দু চাকমা, পীং- মৃত. সুখ চন্দ্র চাকমার নামীয় জায়গা নরুজ্জামান সওদাগর, পীং- মৃত. আবদুল জলিল বেদখল করে।

অন্যদিকে নালকাটা আর্মি ক্যাম্প ও রেজমনি আর্মি ক্যাম্পের মাধ্যমে সেনাবাহিনী পাহাড়িদের জায়গা জোরপূর্বক বেদখল করে আছে। এসব জায়গার মালিকরা জোন কমান্ডার, ব্রিগেড কমান্ডারের কাছে অনেকবার ধর্ণা দেন, কিন্তু তাতে কোন লাভ হয়নি। পক্ষান্তরে বিভিন্ন ভয়-ভীতি দেখিয়ে তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। সেনাবাহিনীর ভয়ে জায়গা মালিকরা এই প্রতিবেদকের কাছে কোনকিছু বলতে সাহস পায়নি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেক গ্রামবাসী বলেন, সেনাবাহিনীর ভয়ে অনেক মহিলা এখন একা একা পাহাড়ে কাজ করতে যায় না। সেনারা মহিলাদের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কয়েক মাস আগে রেজমনি পাড়া আর্মি ক্যাম্পের সেনাবাহিনী ফায়ারিং করার সময় একজন মহিলা পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়। ক্যাম্প থাকলে এ ধরনের আরো অঘটনের আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন গ্রামবাসীরা।

## জবাব দে সন্তু লারমা

১ম পাতার পর

out military from the hill districts was cancelled because Jyotirindra Larma, who signed the peace deal with the government in 1997, so suggested."

সাজেদা চৌধুরী বক্তব্য দেয়ার সময় সন্তু বাবু উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনি তখন কিংবা নিউ এজ-এ উক্ত রিপোর্ট প্রকাশের পর এর কোন প্রতিবাদ করেননি।

উক্ত সেমিনারে উপস্থিত জনৈক সাংবাদিক ব্যক্তিগত আলাপে জানান সাজেদা চৌধুরী সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে সন্তু লারমা সেনা প্রত্যাহার না করতে সরকারকে সুপারিশ করেছিলেন। উক্ত সাংবাদিকের ভাষ্য মতে, সাজেদা ঐ সেমিনারে বলেছেন "দাদা (সন্তু) ভালো, দাদার ভাই (এম এন লারমা) আরো বেশী ভালো। আমরা (সরকার) পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনা প্রত্যাহার করতে চেয়েছি। কিন্তু দাদা মানা করেছেন।"

আমরা সন্তু লারমার কাছ থেকে ব্যাখ্যা চাই কেন তিনি সেনা প্রত্যাহার না করতে সরকারকে অনুরোধ করেছেন। তিনি তো হরহামেশা মুখে ফেনা তুলে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কথা বলেন। অপারেশন উত্তরণ বন্ধ করার কথা বলেন। সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের দাবি তোলেন। একদিকে লোকসম্মুখে সেনাবাহিনীর উপস্থিতির বিরোধীতা করা, অথচ গোপনে সরকারকে সেনা প্রত্যাহার করতে মানা করা -- সন্তু বাবুর এ কেমন দু'মুখো আচরণ?

বহুরূপী সন্তু লারমার এই গণবিরোধী আচরণ ও কথাবার্তা বিশ্বাস করতে অনেকের কষ্ট হতে পারে। কিন্তু এটাই হচ্ছে সত্য। পথভ্রষ্টরা পারে না এমন হীন কাজ নেই। ইতিহাসে দেখা যায়, নিজের গদি রক্ষার্থে ও জীবন বাঁচাতে অনেক রাজা বাদশা ও সেনানায়ক তাদের নিজ দেশের জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। যেমন ১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবের সময় রাজা লুই নিজ দেশের জনগণের বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়ার রাজার সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন। সে সময় ফরাসী বাহিনীর বহু জেনারেল নিজ সৈন্যদল ত্যাগ করে শত্রু বাহিনীর সাথে হাত মেলান এবং ফরাসী জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। ভারতেও বহু রাজা গদি লাভের স্বার্থে অর্থ-বিত্তসহ আপন কন্যা পর্যন্ত হস্তান্তর করেছেন। তাদের চাইতে সন্তু লারমা তো নস্যি, চাকমা ভাষায় "পুনোর কেজ ফরা" মাত্র। গদি রক্ষার্থে ক্ষমতাসীন মন্ত্রী ও সেনা অফিসারদের পদলেহন তার কাছে কিছু নয়। তার প্রমাণ তিনি বহু বার দিয়েছেন।

## অবিলম্বে ধরপাকড়, নিপীড়ন বন্ধ করুন

১ম পাতার পর

ইউপিডিএফ সদস্য প্যারী ভদ্র চাকমা (বয়স ২৮, পিতার নাম বিনি মোহন চাকমা গ্রাম দীঘলছড়ি, কুদুকছড়ি) ও ইন্দ্রজিৎ চাকমাকে (বয়স ৩৫, পিতার নাম নীল কমল চাকমা গ্রাম হেড গরিয়া, আইমাছড়া বরকল) মঙ্গল চাকমার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে।

৩। গত ৩০ জুন গভীর রাতে রাঙ্গামাটি ব্রিগেড থেকে এক মেজরের নেতৃত্বে একটি সেনা দল সন্তু গ্রুপের চার সদস্যকে নিয়ে সামিরা জুরাছড়ি গ্রাম ঘেরাও করে। সন্তু গ্রুপের সদস্যরা হলো সিদ্ধার্থ, বারিজ্যা, হরণ ও নির্মল। তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে খুনসহ ৪-৫টি করে মামলা রয়েছে।

পরদিন ভোরে সেনা সদস্যরা বন চন্দ্র চাকমা (৫৫), তার ছেলে পূর্ণ কুমার চাকমা ও প্রতিবেশী কর্ম ধন চাকমাকে (৪৫) জিজ্ঞেস করে ইউপিডিএফ এর সদস্যরা কোথায় থাকে। তারা জানে না বলে উত্তর দিলে সেনা জওয়ানরা তাদেরকে বেদম মারধর করে। অমানুষিক নির্যাতনের সময় কর্মধন চাকমা চোখে সাংঘাতিক আঘাত পান।

৪। গত ৩ জুলাই সেনাবাহিনীর সদস্যরা কুদুকছড়িতে ইউপিডিএফ সদস্য সন্তু চাকমা (বয়স ২২, পিতার নাম সুরজ্জ চাকমা গ্রাম চিরঞ্জীব দজুর পাড়া, নান্যাচর সদর ইউনিয়ন) ও সুপন চাকমা (বয়স ২০, পিতার নাম মঙ্গল মোহন চাকমা, গ্রাম মহলা পাড়া, বুড়িঘাট ইউনিয়ন, নান্যাচর) এবং সিএনজি চালক প্রতি রঞ্জন চাকমাকে (বয়স ৩৮, পিতার নাম বড়শিরা চাকমা, কুদুকছড়ি বাজার) আটক করে। ইউপিডিএফ সদস্যরা এ সময় প্রতি রঞ্জন চাকমার সিএনজিতে করে মানিকছড়ি যাচ্ছিলেন। সেনা সদস্যরা দুই ইউপিডিএফ সদস্যকে অমানুষিকভাবে মারধর করার পর কতোয়ালি থানায় সোপর্দ করে। পরে আদালত তাদেরকে জামিনে মুক্তি দেয়।

৫। গত ৪ জুলাই রবিবার কুদুকছড়ি বাজারের ইজারাদার কানন কুসুম চাকমা ও ঝাড়ুদার জয় কমল চাকমাকে সেনা সদস্যরা জনসমক্ষে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে।

**খ. গণতান্ত্রিক কার্যক্রমে বাধা**

১। হিল উইমেন্স ফেডারেশন কল্পনা চাকমা অপহরণ বার্ষিকী উপলক্ষে ১২ জুন রাঙ্গামাটি পৌরসভা মিলনায়তনে সভা করতে জেলা প্রশাসনের সম্মতি নিয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করে। কিন্তু শেষ বেলায় এসে প্রশাসন তার পূর্ব অবস্থান থেকে সরে যায় ও অনুষ্ঠানের জন্য অনুমতি দিতে অপারগতা প্রকাশ করে।

এর প্রতিবাদে হিল উইমেন্স ফেডারেশন ১২ জুন রাঙ্গামাটি জেলায় শান্তিপূর্ণ সড়ক অবরোধ পালন করলে মানিকছড়িতে সমঅধিকার নামধারী ঠ্যাঙারে বাহিনী দিয়ে আক্রমণ চালানো হয়। এতে কর্তব্যরত অবস্থায় কমপক্ষে তিন সাংবাদিক ও ১৫ জন হিল উইমেন্স ফেডারেশন কর্মী আহত হন।

২। ২৬ জুন সুবলং ক্যাম্পের একদল সেনা সদস্য ভোর ৬:৩০টার দিকে ইউপিডিএফ-এর সুবলং অফিসে তালা ভেঙে ঢুকে তল্লাশী চালায়। তারা অফিসের কাগজপত্র তছনছ ও ইউপিডিএফ-এর দলীয় পতাকা ছিঁড়ে দেয়। এছাড়া সেনা সদস্যরা অফিসের পাশে দদ্দা চাকমা (৪৫) পীং তলমনি চাকমার বাড়িতেও তল্লাশী চালায়।

**গ. সাজেকে সেনা অপারেশনঃ**

"বহিরাগত সন্ত্রাসী, অবৈধ অনুপ্রবেশকারী এবং ফেরারি আসামীদের ধরার" নামে রাঙ্গামাটির সীমান্তবর্তী এলাকা সাজেক ইউনিয়নে সামরিক অভিযান চালানো হচ্ছে। আমরা মনে করি, এই অভিযানের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো এলাকার নিরীহ পাহাড়িদের ভীত-সন্ত্রস্ত ও হয়রানি করে তাদেরকে বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ করা এবং এরপর সেখানে সেটেলারদের বসতিস্থাপনে সহযোগিতা করা। আমরা এই সেনা অভিযানের ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি ও অবিলম্বে তা বন্ধের আহ্বান জানাচ্ছি।"

**দাবিঃ** মাইকেল চাকমা এরপর সরকারের কাছে ৫ দফা দাবি তুলে ধরেন। দাবিগুলো হলোঃ ১। অবিলম্বে ইউপিডিএফ ও তার সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মী, সমর্থক ও সাধারণ জনগণের ওপর শারীরিক নির্যাতন, হয়রানি এবং বেপরোয়া গ্রেফতার বন্ধ করা। ২। আটককৃত ইউপিডিএফ সদস্যদেরকে অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার ইউপিডিএফ সদস্য ও সমর্থকদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেয়া। ৩। ৫ মে ২০১০ প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে গৃহীত সভায় "ইউপিডিএফ-এর উত্থানকে নিয়ন্ত্রণসীমার মধ্যে রাখার" অগণতান্ত্রিক ও সংবিধান পরিপন্থী সিদ্ধান্ত বাতিল করা। ৪। "অপারেশন উত্তরণ" এর নামে জারি রাখা অঘোষিত সেনা শাসন প্রত্যাহার করে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রকৃত গণতান্ত্রিক পরিবেশ কায়েম করা। ৫। সাজেকে চলমান সেনা অপারেশন বন্ধ করা।

সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কণিকা দেওয়ান, নান্যাচর উপজেলা শাখার সভাপতি যুথিকা চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আরুচি মারমা।

# ১৭ সদস্য বিশিষ্ট পিসিপি'র খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজ শাখা কমিটি গঠিত
## পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম এগিয়ে নেয়ার জন্য ছাত্র সমাজের প্রতি আহ্বান

"পূর্ণস্বায়ত্তশাসন আদায়ের সংগ্রামে এগিয়ে আসুন" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (পিসিপি)-এর খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজ শাখা কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি গঠন উপলক্ষে ১২ জুলাই সকাল ১১টায় খাগড়াছড়ি জেলা সদরের মিলনপুরস্থ রেণা কাবে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত সকলের সম্মতির ভিত্তিতে বিপুল চাকমাকে সভাপতি, সন্দীপন চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও নিক্সন চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক-এর দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটি গঠনপূর্ব আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আপ্রুসি মারমা। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি অংগ্য মারমা, কেন্দ্রীয় সদস্য ঋন্টু চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম-এর কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক মিঠুন চাকমা, এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশন-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কণিকা দেওয়ান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ-এর খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সহ সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রদেব চাকমা এবং সভা পরিচালনা করেন বিপুল চাকমা।

সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য নানা ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত চলছে। ছাত্র সমাজকে বিভক্ত করার মাধ্যমে সরকার এ ষড়যন্ত্র জোরদার করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। প্রশাসন তথা সরকার খাগড়াছড়িতে সভা-সমাবেশের ওপর অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা জারি রাখার মাধ্যমে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার রুদ্ধ করে রেখেছে।

নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রামে সকল ধরনের নিপীড়ন নির্যাতনের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জনিয়ে বলেন, ছাত্ররাই অধিকার আদায়ের আন্দোলনে বলিষ্ট ভূমিকা রাখতে পারে। আগামী দিনের সকল ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত মোকাবেলা করে ছাত্র সমাজকে পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে হবে।

নেতৃবৃন্দ পিসিপি'র শিক্ষা সংক্রান্ত ৫ দফা দাবি আদায়ের লক্ষে সোচ্চার হওয়ার জন্য ছাত্র সমাজের প্রতি আহ্বান জানান এবং অবিলম্বে খাগড়াছড়িতে সভা-সমাবেশের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ও পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের দাবি মেনে নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

## সাজেকে সেনা অপারেশনে উদ্বেগ প্রকাশ

গত ১০ জুলাই ২০১০ শনিবার ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর কেন্দ্রীয় নেতা সচিব চাকমা এক বিবৃতিতে 'বহিরাগত সন্ত্রাসী, অবৈধ অনুপ্রবেশকারী এবং ফেরারি আসামীদের ধরা'র নামে খাগড়াছড়ি জেলার সীমান্তবর্তী সাজেক ইউনিয়নে চলমান সামরিক অভিযানের সংবাদে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে অবিলম্বে তা বন্ধের আহ্বান জানান।

বিবৃতিতে তিনি সাজেকে সেনা অভিযানকে পুরোপুরি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মন্তব্য করে বলেন, "এলাকার নিরীহ পাহাড়িদের ভীত সন্ত্রস্ত করে বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ-এলাকাছাড়া করার মাধ্যমে সেটলারদের বসতি স্থাপনের সুগভীর রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের নীলনক্সার অংশ হচ্ছে এ অভিযান। এমনিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে 'অপারেশন উত্তরণ' জারি থাকায় সর্বত্র সেনা কর্তৃত্ব বজায় রয়েছে। তার ওপর এভাবে ঘোষণা দিয়ে 'অভিযান' কার্যতঃ সেনা শাসনকে সরকার বৈধতা দিচ্ছে। যা পার্বত্য চট্টগ্রামে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়।"

বিবৃতিতে ইউপিডিএফ নেতা সেনা অভিযানের ফলে আশি দশকের নিষ্ঠুর দমন-পীড়ন ও ধ্বংসযজ্ঞের পুনরাবৃত্তি ঘটবে আশঙ্কা প্রকাশ করে আরও বলেন, সাজেকের সমান্তরালে খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা, রাঙামাটির কুদুকছড়ি, জুরাছড়ি ও নান্যাচর এলাকাসহ সর্বত্র ইউপিডিএফ-এর সদস্য ও সমর্থকদের নির্বিচারে গ্রেফতার ও অমানুষিক শারীরিক নির্যাতন চলছে।

বিবৃতিতে ইউপিডিএফ নেতা দেশের সকল গণতান্ত্রিক দল, সংগঠন ও ব্যক্তিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিচালিত সেনা দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার আহ্বান জানিয়েছেন।

### মাদক ও জুয়ার বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলুন

ইদানিং কিছু কিছু এলাকায় মদ চোলাই, বিক্রি ও পানসহ বিভিন্ন নেশা দ্রব্যের ব্যবহার এবং জুয়া খেলা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এলাকায় এলাকায় শিক্ষক, ছাত্র, যুবক, নারী, জনপ্রতিনিধি তথা সমাজের সর্বস্তরের ব্যক্তিদের সমন্বয়ে মাদক ও জুয়া বিরোধী কমিটি গঠন করুন।

পোস্টার, লিফলেট, মিছিল, সমাবেশ ইত্যাদির মাধ্যমে মাদক ও জুয়া বিরোধী প্রচার জোরদার করুন। প্রয়োজনে মদ চোলাইকারী ও জুয়ারীদের বয়কট করুন।

## পিসিপির উদ্যোগে নান্যাচর কলেজে নবীণ বরণ অনুষ্ঠিত

বাবলু চাকমা, নান্যাচর ঃ

রাঙামাটি জেলার নান্যাচর উপজেলায় গত ১৮ জুলাই ২০১০, রবিবার বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ-এর নান্যাচর কলেজ শাখার উদ্যোগে নান্যাচর কলেজের নবাগত শিক্ষার্থীদের নিয়ে নবীণ বরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

কলেজ শাখার সভাপতি বিনয়ন চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নবীণ বরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় নেতা মাইকেল চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রচার সম্পাদক চন্দ্রদেব চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক রিনা দেওয়ান, নান্যাচর সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পঞ্চানন চাকমা, বুড়িঘাট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান প্রণতি রঞ্জন খীসা এবং ঘিলাছড়ি ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মিঠু চাকমা। এছাড়া অন্যান্যের মধ্যে রক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ-এর কেন্দ্রীয় সদস্য ও নান্যাচর থানা শাখার সভাপতি বিলাস চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন-এর রাঙামাটি জেলা শাখার আহ্বায়ক যুথিকা চাকমা এবং পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আপ্রুসি মারমা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক তাপুমনি চাকমা। অনুষ্ঠানে দুই শতাধিক নবীণ ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন।

বক্তারা বলেন, অধিকার আদায়ের আন্দোলনে অতীতেও ছাত্রদের অনেক অবদান রয়েছে। ৫২'র ভাষা আন্দোলন, ৯০'র স্বৈরাচারী এরশাদের পতনের আন্দোলনে ছাত্ররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। একইভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৯৮৯ সালের ৪ঠা মে লঙগদু গণহত্যার মধ্যে দিয়ে ঢাকার রাজপথে মৌন মিছিলের মধ্যে দিয়ে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

ছাত্ররা যে কোন ক্রান্তি লগ্নে ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই আগামী দিনের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে ছাত্র সমাজকে পিসিপি'র পতাকাতলে সমবেত হওয়ার জন্য বক্তারা ছাত্র সমাজের প্রতি আহ্বান জানান। বক্তরা ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবি জানান এবং পিসিপি'র শিক্ষা সংক্রান্ত পাঁচদফা দাবি মেনে নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

## মহালছড়িতে মাদক বিরোধী অভিযান



গত ৩১ জুলাই শনিবার ইউপিডিএফ, পিসিপি এবং গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের মহালছড়ি থানা ইউনিটসমূহ যৌথভাবে মহালছড়ি উপজেলার মাইসছড়ি বাজারে মাদক বিরোধী অভিযান চালায়।

অভিযান চলাকালে প্রকাশ্যে মদ বিক্রি করার সময় হাতে নাতে কয়েক বোতল মদসহ তিন মহিলাকে আটক করা হয়। এরা হলেন হাসিনা চাকমা (৪৫), স্বামী- কমল চাকমা, গ্রাম-বেতছড়ি ভিতর পাড়া, রূপালী চাকমা (৩০) স্বামী সঙ্গ চাকমা, গ্রাম-বেতছড়ি মধ্যম পাড়া ও কনকনা চাকমা (৫৮) স্বামী চিত্ত কুমার চাকমা গ্রাম-বেতছড়ি মধ্যম পাড়া।

অভিযানের টের পেয়ে কয়েকজন মদ বিক্রেতা দ্রুত পালিয়ে যায়। আটককৃত মদ জনসমক্ষে ফেলে দিয়ে নষ্ট করা হয় এবং মদ বিক্রয়কারী মহিলাদেরকে ভবিষ্যতে আর মদ বিক্রি করবে না এই শর্তে ছেড়ে দেয়া হয়।

বাজারে অবাধে মদ বিক্রি করা হলেও প্রশাসনের কোন নজরদারি নেই। বরং প্রশাসন মদ বিক্রি করতে উৎসাহ প্রদান করে থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে। এভাবে অবাধে মদ বিক্রির ফলে যুব সমাজ অধঃপতনের দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং সমাজে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে।

## পিসিপি'র নান্যাচর কলেজ কমিটির দ্বিতীয় কাউন্সিল সম্পন্ন

ঃ বিনয়ন চাকমা, নান্যাচর ঃ

গত ৫ আগস্ট ২০১০, বৃহস্পতিবার বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ-এর নান্যাচর কলেজ শাখার দ্বিতীয় কাউন্সিল সম্পন্ন হয়েছে।

কাউন্সিল উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় কলেজ শাখার সভাপতি বিনয়ন চাকমার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন কলেজ শাখার শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক সম্পাদক মিন্টু চাকমা, থানা শাখার দপ্তর সম্পাদক বিদু খীসা, থানা শাখার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সদস্য বিলাস চাকমা এবং গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের থানা শাখার সভাপতি প্রিয় লাল চাকমা।

আলোচনা সভার পর উপস্থিত সকলের সম্মতির ভিত্তিতে রিপন চাকমাকে সভাপতি, অনিল চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক এবং সুগত চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট নান্যাচর কলেজ কমিটি গঠন করা হয়। নতুন কলেজ কমিটিকে স্বাগত জানান থানা শাখার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সদস্য বিলাস চাকমা।

কাউন্সিল শেষে নবগঠিত কলেজ কমিটির উদ্যোগে এক র‍্যালী বের করা হয়। র‍্যালীটি নান্যাচর বাজার প্রদক্ষিণ করে উপজেলা সদরে এসে শেষ হয়।

## খাগড়াছড়িতে পিসিপি'র উদ্যোগে নবীণ বরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

ঃ খাগড়াছড়ি কলেজ প্রতিনিধিঃ

"ওরে নবীণ ওরে আমার কাঁচা, আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা" রবি ঠাকুরের এই পঙক্তিকে উপজীব্য করে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ-এর খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজ শাখার উদ্যোগে খাগড়াছড়ি সদরের সকল কলেজের নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে নবীণ বরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ৩১ জুলাই সকাল ১১টায় "ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট" হল রুমে অনুষ্ঠিত নবীণ বরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সরকারি কলেজ শাখার সভাপতি বিপুল চাকমা। এতে উপস্থিত ছিলেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি অংগ্য মারমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক মিঠুন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কণিকা দেওয়ান, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আপ্রুসি মারমা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ লেখক শিবির-এর সাংস্কৃতিক সম্পাদক হেমন্ত দাশ, বিপ্লবী ছাত্র সংঘের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক আশীষ শর্মা, ল্যাম্পপোস্টের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক প্রিন্স। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের জেলা শাখার সহ সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রদেব চাকমা।

অনুষ্ঠানে নবীণ ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে মানপত্র পাঠ করা হয় এবং রজনী গন্ধা ফুল দিয়ে নবীণদের বরণ করে নেয়া হয়।

বক্তারা নবীণদের উদ্দেশ্যে বলেন, নতুন-নবীণ মানেই প্রত্যাশা। নতুন মানেই উদ্যম, গতিশীলতা আর উজ্জ্বলতা। যা কিছু প্রগতির প্রতিবন্ধক, পুরোনো অচল তা ছুঁড়ে ফেলে সামনে এগিয়ে চলাই নবীণের ধর্ম। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, কলুষিত সমাজ আর রাষ্ট্রের কূটকৌশলের শিকার হয়ে অনেক সম্ভাবনাময় নতুন বিপথে পরিচালিত হয়। সব নতুন কুঁড়ি প্রস্ফুটিত হতে পারে না। সমাজে আশার আলো জাগানোর পরিবর্তে দুশ্চিন্তা ও আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ ব্যাপারে অবশ্যই নবীণ বন্ধুদের সজাগ থাকতে হবে।

বক্তারা আরো বলেন, নবীণরা অনভিজ্ঞ হলেও তাদের ভিতরে যে সাহস, উদ্যম রয়েছে তা দিয়ে শোষণ, বঞ্চনার বিরুদ্ধে জনতার শক্তি হিসাবে নিজেকে দাঁড় করাতে হবে। ছাত্র সংগঠনের মাধ্যমে ছাত্র সমাজকে নিপীড়ন-নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে হবে।

## পানছড়িতে সেটলার বাঙালি কর্তৃক এক পাহাড়ি খুন

*পানছড়ি সংবাদদাতা:* গত ১৭ আগস্ট ২০১০ রাত আনুমানিক ১০টার সময় খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়িতে সেটলার বাঙালি কর্তৃক সুদীপ্ত চাকমা ওরফে সাইরেন (৩২) এক ব্যক্তি খুন হয়েছেন। তার বাড়ি ৪০ নং প্রকল্প গ্রাম, ইউপি-ভাইবোন ছড়া, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা। তার পিতার নাম বিনয় চাকমা।

জানা যায়, সুদীপ্ত চাকমা তার সঙ্গী শান্তি মনি চাকমাসহ পানছড়ির বরকলক গ্রাম থেকে তার শ্বশুর বাড়ি অক্ষয় পাড়ায় ফিরছিলেন। ফেরার পথে সেটলার পাড়া কলাবাগানে পৌছলে সেখানে আলী আশরাফের ছেলে শফিউল্লাহর (৩৫) দোকান থেকে বিড়ি-সিগারেট কিনতে চাইলে দোকানদার তাদের সাথে খারাপ আচরণ করেন। এক পর্যায়ে তাদের কথা কাটাকাটি হলে শফিউল্লাহসহ কয়েকজন বাঙালি মিলে সুদীপ্তদের উপর হামলা চালায়। শান্তি মনি চাকমা পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও বাঙালিদের উপর্যুপরি আঘাতে সুদীপ্ত চাকমা মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পরে কয়েক জন বাঙালি তাকে পানছড়ি সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার পর পানছড়ি থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ শফিউল্লাহ'র পিতা ও ভাইসহ চারজনকে গ্রেফতার করেছে। তবে মূল হত্যাকারী শফিউল্লাকে পুলিশ এখনো গ্রেফতার করতে পারেনি। সে বর্তমানে পলাতক রয়েছে।

## সম্পাদকীয়

১মবর্ষ ‖ ৭মসংখ্যা ‖ ১১ আগষ্ট ২০১০

### ভূমি কমিশন, ভূমি জরিপ ও চুক্তি বাস্তবায়ন

আইনগত দিক নিষ্পত্তি না করেই ভূমি কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপ করতে চাইছে। এ কারণে দেখা দিয়েছে জটিলতা। তাছাড়া ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যানকে ঘিরেও রয়েছে নানা প্রশ্ন। সাজেক ধ্বংসযজ্ঞের সময় সপরিবারে বান্দরবানে ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যানের বিলাস ভ্রমণ লোকে সহজভাবে গ্রহণ করে নি। সরকার ভূমি কমিশন গঠন করেই যেন দায় খালাস করেছে। কমিশনের দপ্তর, লোকবল নিয়োগ ও নীতিমালা প্রণয়নসহ আবশ্যকীয় বহু বিষয় এখনো ঠিক হয়নি।

আশি দশকের শুরুতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে চার লক্ষাধিক সেটলারকে জিয়া ও এরশাদ সরকার কর্তৃক জোরপূর্বক পাহাড়িদের বংশপরম্পরার জায়গা-জমিতে বসতিস্থাপন পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে প্রকট করে তোলার প্রধান কারণ--এটি এখন বলতে গেলে প্রতিষ্ঠিত সত্য। এ সত্যটি মেনে নিলে এটাও মেনে নিতে হয় যে, সেটলাররাই হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি বেদখলকারী। এ মৌলিক বিষয় ফয়সালা করেই পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিতে হবে।

দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরুর আগে ভূমি কমিশন বিতর্কীত হয়ে পড়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রথাগত ভূমি অধিকারের প্রতি কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন না করে ভূমি কমিশন মনগড়া, খেয়ালখুশীমত একতরফাভাবে গণবিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছে। এতে বংশপরম্পরার ভূমি মালিক পাহাড়ি ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পুনর্বাসিত সেটলার উভয়কে এক কাতারে ফেলে বিরোধপূর্ণ জমির ব্যাপারে আবেদন জানাতে বলা হয়েছে। এতে পাহাড়িদের প্রতি চরম অবিচার ও ভূমিবেদখলকারী সেটলারের প্রতি অপরিমেয় সুযোগ দেয়া হয়েছে। সেটলাররা অবৈধ ভূমি দখলকারী। তাদের আবাসস্থল-জায়গা জমি কোন না কোন পাহাড়ির মালিকাধীন। অথচ সবাইকে আবেদন করার সুযোগ দানের কারণে সেটলাররাই এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে আবেদন শুরু করেছে। আর বংশপরম্পরার মালিক হয়েও পাহাড়িরা রাষ্ট্রের মারপ্যাঁচ ও ভূমি কমিশনের বৈরীতার কারণে নিজ জমির মালিকানার আবেদন জানাতে হিমশিম খাচ্ছে। এর ফলে সমস্যা আরও জটিল হবে তা বলাই বাহুল্য। দীঘিনালার সাধনাটিলার বৌদ্ধ বিহারের জায়গাটি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। '৮৬ সালে সেনা-সেটলার হামলার মুখে দীঘিনালাবাসী পাহাড়িরা বাস্তুভিটা ছেড়ে ত্রিপুরা রাজ্যে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এ সুযোগে সেটলাররা সাধনাটিলার পাহাড়িদের জায়গা-জমি বেদখল করে নেয়। এমনকি বিহারেরও জায়গাও তাদের আগ্রাসন থেকে বাদ পড়ে নি। জরুরি অবস্থার সময়ে অর্থাৎ বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সেটলাররা সেনা মদদে আবার বৌদ্ধ বিহারটি বেদখল করতে চেয়েছিল। এলাকাবাসীর সম্মিলিত প্রতিরোধের মুখে তা করতে পারে নি। বিহারের জায়গার মালিকানা নিয়ে বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। সাধারণ আদালতও বিহারের জায়গার প্রকৃত মালিকদের পক্ষে রায় দেয়। কিন্তু বিপত্তি দেখা দিচ্ছে ভূমি কমিশনের বিজ্ঞপ্তি ঘিরে। সাধারণ আদালতের মামলায় হেরে গিয়েও সেটলাররা ভূমি কমিশনের বিজ্ঞপ্তিতে যেন আবার শক্তি ফিরে পেয়েছে! তারা আবার বিরোধপূর্ণ জমির উছিলা দেখিয়ে আদালত কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত ভূমির ব্যাপারেও আবেদন করতে শুরু করেছে। এটি যে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে তাতে সন্দেহ নেই। অন্যদিকে পাহাড়িরা একেতঃ ভূমি কমিশনের প্রতি আস্থাশীল নয়, তদুপরি আইনগত বিষয়ে অনভিজ্ঞ। ফলে নিজ পৈতৃক জায়গা জমির ওপর বৈধ মালিকানা প্রমাণ করতে সক্ষম হবে না। এখানে প্রসঙ্গক্রমে এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সেটলার পুনর্বাসনের সমানতালে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ও পোড়ানো হয়েছে। এটি এখনও রহস্যাবৃত। সরকারিভাবে এত বড় ঘটনার কোন তদন্ত কমিটি গঠন বা তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হবার কথা জানা যায় নি। ভূমি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল পুড়ে গেছে বলে বলা হয়েছে। দলিল দস্তাবেজের প্রচলন পার্বত্য চট্টগ্রামে বেশি দিনের কথা নয়, প্রথাগত মালিকানা অনুসারে তা প্রয়োজনও হত না। তার ওপর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় পুড়ে যাবার কারণে অধিকাংশ পাহাড়িরই দলিলপত্র খোয়া গেছে। অন্যদিকে সরকার সেটলারদের মালিকানা নিশ্চিত করতে হেডম্যানদের বাধ্য করিয়ে কৃত্রিম দলিলপত্র হস্তান্তর করেছে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয় পুড়ে যাবার ঘটনাকে অভিজ্ঞমহল সেটলারদের মালিকানা নিশ্চিত করার সুক্ষ্ম ষড়যন্ত্র বলে মনে করেন। ভূমি কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা নিষ্পত্তির চেয়ে যদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পুনর্বাসিত সেটলারদের ভূমি মালিকানা নিশ্চিত করতে নিয়োজিত থাকে তাহলে তা ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করবে।

ইতিমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রধান রাজনৈতিক দল ইউপিডিএফ ভূমি কমিশনের কার্যকলাপের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে অন্য দু'টি দল রূপায়ন দেওয়ান-সুধাসিন্ধু খীসা নেতৃত্বাধীন জনসংহতি সমিতির প্রধান ধারা ও সন্তু লারমা নেতৃত্বাধীন জনসংহতি সমিতি সন্তু গ্রুপও আপত্তির কথা প্রকাশ করেছে। ভূমি বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক দলসমূহের দাবি বলতে গেলে অভিন্ন।

ঢাকায় অনুষ্ঠিত আদিবাসী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক সেমিনারে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান সাজেদা চৌধুরী 'যুদ্ধাপরাধী বিচার সম্পন্ন হবার পর পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নেয়ার' কথা বলেছেন। তার এ বক্তব্যও জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। যুদ্ধাপরাধীর বিচার আওয়ামী লীগ তার মেয়াদের মধ্যে সম্পন্ন করতে সক্ষম হবে কিনা সন্দেহ। যদি তা করতে সক্ষমও হয়, তাহলেও তা অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়কে যুদ্ধাপরাধী ইস্যুর সাথে জুড়ে দেয়া মোটেও সদিচ্ছার পরিচয় বহন করে না। '৯৬ সালে ক্ষমতায় বসে আওয়ামী লীগ সে যাত্রায় পার্বত্য চুক্তি সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন করে নি। দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতাসীন হবার শর্ত জুড়ে দিয়েছিল। এবার আবার যুদ্ধাপরাধী ইস্যু নিষ্পত্তি হবার কথা বলছে। স্বাভাবিকই প্রশ্ন আসে, আসলে আওয়ামী লীগ আদৌ চুক্তি বাস্তবায়ন করবে কি?

## বাংলাদেশ সংবিধান ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অধিকার

ন্যু চিং

**সংশোধিত সংবিধানে যাতে অতীতের ভুলের পুনরাবৃত্তি না হয় আমরা সেটাই আশা করি। অতীতের ওপর আমাদের কোন হাত নেই। অতীতকে আমরা সংশোধন করতে পারি না। কিন্তু অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা বর্তমানে ভুল এড়াতে পারি। সংবিধানে ক্ষুদ্র জাতিগুলোকে তাদের ন্যায্য অধিকার দিয়ে বাংলাদেশকে তার ঐতিহাসিক দায় থেকে মুক্তি দেয়ার সময় এসেছে। যদি সেটা করতে আমরা ব্যর্থ হই তাহলে তার জন্য ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করবে না।**

জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ সংবিধান গৃহীত হয় ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর এবং কার্যকর হয় একই বছর ১৬ ডিসেম্বর। মোট ১২টি ভাগে বিভক্ত (নবম ক ভাগসহ) সংবিধানে দেশের ক্ষুদ্র জাতিগুলোর স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। শুধু তাই নয়, আদি সংবিধানের ৬(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়, বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি নামে পরিচিত হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত তৎকালীন সংসদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এর তীব্র প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, একজন বাঙালি যেমন কখনো একজন চাকমা হতে পারে না, অনুরূপ একজন চাকমা, মারমা কিংবা ত্রিপুরা কখনো বাঙালি হতে পারে না। তিনি নবলব্ধ রাষ্ট্রের সংবিধান অনুমোদন না করে সংসদ থেকে ওয়াক আউট করেছিলেন। সে হিসেবে বলা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ বাংলাদেশ সংবিধানকে মেনে নেয়নি।

নতুন সংবিধান গৃহীত হবার পর ৩৮ বছর অতিবাহিত হয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র ও পার্বত্য চট্টগ্রামে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সামরিক ক্যু ও কাউন্টার ক্যুর মাধ্যমে সামরিক জেনারেলরা ক্ষমতায় এসে দেশ শাসন করেছে। তারা সংবিধানকে বলাৎকার করেছে; নিজেদের শাসন অটুট রাখার জন্য গায়ের জোরে তাকে ইচ্ছামত সংশোধন করেছে। জেনারেল জিয়াউর রহমান সংবিধানের প্রারম্ভে "বিসমিল্লাহির রাহমানের রহিম" ঢুকিয়ে শাসনব্যবস্থায় যে ইসলামীকরণের সূচনা করেছিলেন, স্বৈরাচারী এরশাদ তাকে চূড়ান্ত পরিণতির দিকে নিয়ে যান অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করে। এঙ্গেলস-এর কথায়, পেট্রিয়েটিজম ইজ দ্য লাস্ট রিজর্ট অব দ্য স্কাউন্ড্রেলস। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বলা যায়, শুধু দেশপ্রেম নয়, ধর্মও এরশাদের মতো স্কাউন্ড্রেল বা কুলাঙ্গারদের হলো শেষ আশ্রয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এরশাদের শেষ রক্ষা হয়নি, রাষ্ট্র ধর্ম বিল পাশের দেড় কি দুই বছরের মাথায় প্রবল গণঅভ্যুত্থানের মুখে তিনি অপমানজনকভাবে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম করে ধর্ম হিসেবে তার বিশেষ কী মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে তা বলা না গেলেও এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে এতে ক্ষুদ্র জাতিগুলোর মনে এই সংশয় দৃঢ় হয়েছে যে, এই রাষ্ট্র তাদের অস্তিত্ব ধীরে ধীরে লুপ্ত করে দেয়ার ষড়যন্ত্র জারী করা হয়েছে। এরশাদ সাহেব যখন ১৯৮৮ সালে সংসদে এই রাষ্ট্র ধর্ম বিল পাশ করছিলেন, তখন আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ প্রায় সব রাজনৈতিক দল এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, যখন এই দলগুলো নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এলো তখন কেউ এই অষ্টম সংশোধনী বাতিল করেনি। বাংলাদেশের শাসক দলগুলোর এই নির্লজ্জ হিপোক্রিসি এক কথায় সন্তাশ্বার্থের মতোই বিস্ময়কর।

বাংলাদেশ সংবিধান আজ পর্যন্ত ১৪বার সংশোধন করা হয়েছে। কোন কোন সংশোধনী আনা হয়েছে কেবল ব্যক্তি বিশেষের খায়েশ পূরণের জন্য। অথচ দেশেরই নাগরিক চিরঅবহেলিত, বঞ্চিত ও নির্যাতিত ক্ষুদ্র জাতির জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য সংবিধান সংশোধনের কথা কেউ ভাবেনি। সংখ্যার বিচারে তারা নগণ্য হতে পারে এবং তারা বিকাশের পশ্চাদপদ স্তরে থাকতে পারে, কিন্তু জাতিসত্তা হিসেবে তারা স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল সংবিধানে থাকা একান্ত জরুরী। যে রাষ্ট্র ও সংবিধান ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অস্তিত্ব ও অধিকারের স্বীকৃতি দেয় না, সেই রাষ্ট্র ও সংবিধান কখনোই গণতান্ত্রিক হতে পারে না। যে দেশে সংখ্যালঘু জাতিসমূহের স্বীকৃতি নেই সে দেশে তাদের নিরাপত্তা থাকতে পারে না। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বিগত ৩৯ বছরের ইতিহাস তার সাক্ষী।

বর্তমান সরকার ২১ জুলাই সংবিধান সংশোধনের জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করেছে সংসদ উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী ও সুরঞ্জিত সেনগুপ্তকে প্রধান করে। এটা নিঃসন্দেহে একটা ভালো উদ্যোগ। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণসহ দেশের সংখ্যালঘু জাতিগুলোর মনে এক ধরনের আশার সঞ্চার হয়েছে। তারা আশা করছেন এবার হয়তো সংবিধানে তাদের জাতিসত্তার অস্তিত্ব ও অধিকারের স্বীকৃতি মিলবে। সরকার তাদের প্রত্যাশা পূরণে কতটুকু সফল হবে তা এখন দেখার বিষয়।

১৯৭২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি নেতৃবৃন্দ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে তৎকালীন সংবিধান প্রণয়ন কমিটির কাছে ক্ষুদ্র জাতিগুলোর অধিকার রক্ষার জন্য ন্যূনতম কিছু দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের সে দাবি প্রত্যাখ্যান করা হয়। সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের আলাদা বৈশিষ্ট্য মুছে ফেলা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ যে সীমিত স্বায়ত্তশাসন ভোগ করছিলেন (অতীতে বৃটিশ আগ্রাসনের আগে তারা কার্যতঃ স্বাধীন ছিলেন) তা রদ করা হয়। পশ্চাদপদ জাতি হিসেবে পাহাড়ি জনগণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষিত হয়। ফলে তৎকালীন পাহাড়ি নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশ রাষ্ট্রে তাদের জাতীয় অস্তিত্ব টিকে থাকার সম্ভাবনা নিয়ে শংকিত হয়ে উঠেছিলেন।

দেশের আদি সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জাতিসমূহের অস্তিত্ব ও অধিকারের স্বীকৃতি না দেয়ার ফল হয় ভয়াবহ। নতুন উগ্র বাঙালি জাত্যাভিমান ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে সচেতন শিক্ষিত পাহাড়িদের মধ্যে প্রথমে ক্ষোভ ও বিক্ষোভ দানা বেঁধে ওঠে এবং পরে এক সময় তা সশস্ত্র সংগ্রামে রূপ নেয়। শুরু হয় রক্তক্ষয়ী সংঘাত -- যা দুই দশকের অধিক সময় ধরে চলে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত হয়। এ সময় বেশ কয়েকটি গণহত্যা সংঘটিত হয়, এতে হাজার হাজার নিরীহ পাহাড়ি নিহত হন এবং পাহাড়িরা নিজ মাতৃভূমি ছেড়ে ভারতে শরণার্থী হতে বাধ্য হন। ফলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অপরদিকে, ফৌজি শাসক জিয়াউর রহমান ও হুসেইন

৭ম পাতায় দেখুন

# এনজিওগুলো হলো আধুনিক যুগে ধর্মনিরপেক্ষ মিশনারী

অরুন্ধতী রায়

**এই অনুবাদটি প্রথম ছাপা হয় ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর মুখপত্র স্বাধিকার এর ৩০তম সংখ্যায় (৩ নভেম্বর ২০০৪)। পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এর গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতার কথা বিবেচনা করে লেখাটি এখানে পুনর্মুদ্রণ করা হলো।**

*[১৬ আগষ্ট ২০০৪ ভারতীয় লেখিকা অরুন্ধতী রায় আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার সান ফ্রানসিসকোকে আমেরিকান সোসিওলোজিক্যাল এসোসিয়েশনের ৯৯তম বার্ষিক সভায় উপচে পড়া জনতার উপস্থিতিতে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। কনফারেন্সের বিষয়বস্তু ছিল "Public sociologies". তার বক্তব্য তাৎক্ষণিকভাবে বিভিন্ন টিভি চ্যানেল ও রেডিওতে সম্প্রচার এবং ই-মেইলের মাধ্যমে সারা বিশ্বব্যাপী বিলি করা হয়। ভারতের Frontline ম্যাগাজিনের অক্টোবর ৯ - ২২, ২০০৪ সংখ্যায় "Public Power in the Age of Empire" শিরোনামে প্রকাশিত তার এই দীর্ঘ বক্তৃতা থেকে এখানে এনজিও সম্পর্কিত অংশটি অনুবাদ করে ছাপানো হলো। - সম্পাদক।]*

গণ আন্দোলনকে দ্বিতীয় যে ঝুঁকির মোকাবিলা করতে হচ্ছে সেটি হলো প্রতিরোধ সংগ্রাম-এর এনজিও-করণ। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা বিকৃত করা সহজ হবে -- বলা হতে পারে যে আমি সকল এনজিওকে অভিযুক্ত করছি। কিন্তু সেটা হবে একটা মিথ্যা। বরাদ্দকৃত অর্থ পাচার অথবা কর ফাঁকি দেয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত (বিহারের মতো রাজ্যে সে রকম অর্থ যৌতুক হিসেবে দেয়া হয়) ভুয়া এনজিও-র মধ্যে অবশ্যই কিছু এনজিও মূল্যবান কাজ করছে। তবে, এখানে গুটিকয় এনজিও বিশেষের ইতিবাচক কাজ থেকে আমাদের দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে এনজিও সংক্রান্ত বিষয়কে বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিচার করা গুরুত্বপূর্ণ।

উদাহরণস্বরূপ ভারতে বিদেশ থেকে ফান্ড পাওয়া এনজিও-র বিস্তৃতি ঘটতে শুরু করে ১৯৮০ দশকের শেষের দিকে ও ১৯৯০ দশকে। এটা ঘটে সে সময় যখন ভারতীয় বাজারকে নব্য-উদারনীতিবাদের (neoliberalism) কাছে খুলে দেয়া হচ্ছিল। সেই সময়ে অবকাঠামোগত সংস্কারের চাহিদা অনুসারে ভারত সরকার গ্রাম উন্নয়ন, কৃষি, বিদ্যুত ও শক্তি, পরিবহন ও গণস্বাস্থ্য থেকে ভর্তুকি তুলে নিচ্ছিল। কাজেই সরকার তার ঐতিহ্যগত ভূমিকা ত্যাগ করলে এনজিওগুলো সে সব খাতে কাজ করার জন্য ঢুকে পড়ে। তবে পার্থক্য হলো, এনজিওগুলোর লভ্য অর্থের পরিমাণ তুলে-নেয়া প্রকৃত গণ ভর্তুকির অর্থের তুলনায় একটি নগণ্য ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। অধিকাংশে বৃহৎ সু-অর্থায়িত এনজিও উন্নয়ন ও সাহায্য সংস্থার কাছ থেকে অর্থ ও পরামর্শ পেয়ে থাকে। আবার এই উন্নয়ন ও সাহায্য সংস্থাগুলো অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকে পশ্চিমা সরকারসমূহ, বিশ্ব ব্যাংক, জাতিসংঘ ও কিছু বহুজাতিক কর্পোরেশনের কাছ থেকে। এই এনজিওগুলো একই সংস্থাভুক্ত না হলেও তারা অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত একই ঢিলেঢালা রাজনৈতিক কাঠামোর, যে কাঠামো নব্য-উদারনীতি পরিকল্পনার দেখভাল করে ও প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারী ভর্তুকি কমানোর দাবি জানায়।

**এনজিওগুলোর আসল ভূমিকা হলো রাজনৈতিক ক্রোধকে প্রশমিত করে দেয়া এবং জনগণের যা অধিকার হিসেবে প্রাপ্য তা সাহায্য বা উপকার হিসেবে বিতরণ করা। তারা জনগণের চিন্তাজগৎকে পরিবর্তন করে দেয়। তারা জনগণকে পরনির্ভরশীল বানায় ও তাদের রাজনৈতিক প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ভোঁতা করে দেয়।**

কেন এসব সংস্থাগুলো এনজিও-দেরকে অর্থায়ন করে থাকে? এটা কি কেবল সেই পুরোনো মিশনারী মনোবৃত্তি? অপরাধবোধ? এটা আসলে সে রকম কিছু নয়।

এনজিওগুলো এই ধারণা দেবার চেষ্টা করে যে, তারা একটি পশ্চাদপসরণরত সরকার কর্তৃক সৃষ্ট শুন্যতাকে পূরণ করছে। হ্যাঁ তারা তা করছে, তবে সেটা বস্তুগতভাবে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। এনজিওগুলোর আসল ভূমিকা হলো রাজনৈতিক ক্রোধকে প্রশমিত করে দেয়া এবং জনগণের যা অধিকার হিসেবে প্রাপ্য তা সাহায্য বা উপকার হিসেবে বিতরণ করা। তারা জনগণের চিন্তাজগৎকে পরিবর্তন করে দেয়। তারা জনগণকে পরনির্ভরশীল বানায় ও তাদের রাজনৈতিক প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ভোঁতা করে দেয়। এনজিওগুলো সরকার ও জনগণের মধ্যে এবং সাম্রাজ্য ও অধীনস্থদের মধ্যে এক ধরনের বাফার (Buffer) হিসেবে কাজ করে। তারা আলোচনায় সালিশ নিষ্পত্তিকারী, ব্যাখ্যাদাতা ও মধ্যস্থতাকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। তারা অন্যায় ও অযৌক্তিক যুদ্ধে "গ্রহণযোগ্য লোকটির" ভূমিকা পালন করে থাকে।

চূড়ান্ত বিচারে, এনজিওগুলো তাদের অর্থ দাতাদের কাছেই দায়বদ্ধ, যে জনগণের মধ্যে তারা কাজ করে তাদের কাছে নয়। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা যাকে সূচক প্রজাতি (indicator species) বলে থাকেন এনজিওগুলো হলো তাই। এটা যেন এ রকমই যে, নব্য-উদারনীতি দ্বারা সৃষ্ট ধ্বংসযজ্ঞ যতবেশী ব্যাপক, এনজিওগুলোর প্রাদুর্ভাবও তত বেশী হয়ে থাকে। এর সত্যতা সবচাইতে তীক্ষ্ণভাবে ধরা পড়ে এতে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন কোন একটি দেশ দখলের প্রস্তুতি নেয়, তখন সে একই সময়ে এনজিওগুলোকে প্রস্তুত করে রাখে যাতে তারা ঐ দেশটাতে গিয়ে সৃষ্ট ধ্বংসযজ্ঞের জঞ্জাল সাফ করার কাজ করতে পারে।

তাদের আর্থিক উৎস যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং যে দেশে তারা কাজ করে সে দেশের সরকার যাতে তাদের কাজের অনুমতি দেয় সেটা নিশ্চিত করার জন্য এনজিওগুলোকে তাদের কাজকে কমবেশী রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত বর্জিত একটি ঢিলেঢালা কাঠামোর মধ্যে উপস্থাপন করতে হয়। সেটা হতে পারে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ কিংবা রোগের প্রাদুর্ভাবজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত যে কোন দেশে। তবে যাই হোক না কেন, সেটা হবে অবশ্যই একটি অসুবিধাজনক ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিত। "এনজিও প্রেক্ষিত" যে দ্রুত মর্যাদা পাচ্ছে সেটা অকারণে নয়।

গরীব দেশ ও যুদ্ধাঞ্চল থেকে পাঠানো তাদের অরাজনৈতিক ও (এবং সেজন্য আসলে চরম রাজনৈতিক) সংকট-সম্পর্কিত রিপোর্টগুলো (distress reports) প্রকৃত অর্থে সে সব (কৃষ্ণ) দেশের (কৃষ্ণ) জনগণকে মনস্তাত্ত্বিক শিকার বানিয়ে ফেলে। আর একজন অপুষ্টিতে ভোগা ভারতীয়, আর একজন ক্ষুধার্ত ইথিওপিয়ান, আর একটি আফগান শরণার্থী শিবির, আর একজন পঙ্গু সুদানীর .... জন্য সাদা মানুষের সাহায্য দরকার। তারা ধূর্ততার সাথে গতানুগতিক বর্ণবাদী ধারণাকে জোরদার করে এবং পশ্চিমা সভ্যতার সাফল্য, আরাম আয়েশ ও করুণাকে (কঠিন প্রেমে) পুনর্ব্যক্ত করে। তবে গণহত্যা, উপনিবেশবাদ ও দাস প্রথার ইতিহাসের অপরাধবোধকে বাদ দিয়ে। এনজিওগুলো হলো আধুনিক যুগে ধর্মনিরপেক্ষ মিশনারী।

এনজিওগুলোর অর্থকড়ি বিকল্প রাজনীতির ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে যে ভূমিকা -- কম মাত্রায় তবে অধিক ক্ষতিকরভাবে -- পালন করে থাকে তা হলো ফটকা পুঁজির মতো, যা একটা গরীব দেশের অর্থনীতিতে আসা যাওয়া করে থাকে। কি হবে না হবে সে ব্যাপারে নির্দেশ দিতে শুরু করে।

এনজিওগুলোর পুঁজি সম্মুখ সংগ্রামকে আলোচনার দিকে নিয়ে যায়। প্রতিরোধকে রাজনীতি বিযুক্ত করে। তারা স্থানীয় জনগণের আন্দোলনে হস্তক্ষেপ করে, যে আন্দোলন ঐতিহ্যগতভাবে ছিল আত্মনির্ভরশীল। এনজিওগুলোর টাকা থাকে সে সব স্থানীয় লোকজনকে চাকুরী দেয়ার, যারা অন্যথায় প্রতিরোধ আন্দোলনের কর্মি হতে পারতো, কিন্তু চাকুরী পেয়ে তারা ভাবে যে তারা তাৎক্ষণিক, সৃষ্টিশীল কিছু একটা করছে (এবং এটা করে তারা আয় উপার্জনও করছে)। দান (Charity) দাতা ও গ্রহীতা উভয়কে তাৎক্ষণিক আত্মসুখ দেয়। তবে তার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে ভয়াবহ। প্রকৃত রাজনৈতিক প্রতিরোধ সংগ্রাম সে রকম সহজ সরল পথ দেখায় না।

রাজনীতির এনজিও-করণ প্রতিরোধ সংগ্রামকে ভদ্র, গ্রহণযোগ্য, বেতনধারীদের সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সময় ধরে চলা আনুষঙ্গিক সুবিধাসহ একটা চাকুরীতে রূপান্তরিত করতে চায়।

সত্যিকার প্রতিরোধ সংগ্রামে আছে সত্যিকার ফল। এখানে কোন বেতন নেই।

.....

অরুন্ধতী রায় হলেন দি গড অব স্মল থিঙ্গস উপন্যাসের লেখিকা। এই উপন্যাসের জন্য তিনি ১৯৯৭ সালে বুকার পুরস্কার লাভ করেন।

# বড় মোনে জুমচাষ বন্ধ করতে হবে

অমর চাকমা

জুম চাষের দৃশ্যঃ ছবি শুভাশীষ চাকমা

**কথাটি** আপাত দৃষ্টিতে স্ববিরোধী মনে হতে পারে এবং যারা জুমচাষ করে জীবন নির্বাহ করছেন তাদের নিকট খুবই অপ্রিয় হবে। প্রস্তাবনার বিপক্ষে হয়তো অনেক যুক্তি উপস্থাপন করা যাবে। কিন্তু এতদ সত্ত্বেও বর্তমান বাস্তবতায় আমাদের বড় মোনে জুম চাষ বন্ধ করা খুবই জরুরী হয়ে পড়েছে। অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি আমার এ বক্তব্য জুমচাষীরা মেনে নেবেন না। কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভেবে যত দ্রুত সম্ভব বড় মোনে জুমচাষ বন্ধ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বড় মোনে জুম চাষ করলে লাভ ক্ষতি দুই-ই আছে। তবে বর্তমানে ক্ষতির ভাগটা বেশী হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বড় মোনে জুম চাষে লাভের দিক হলো, ভালো উৎপাদন। যেমন, ধান, হলুদ, তিল (ঘোজ্যা) এবং নানান তরিতরকারী একই সাথে উৎপাদন করা যায়। জমিতে ধান উৎপাদনের খরচ হলকৃষির চাইতে জুমে অনেক কম। এক কথায় জুম চাষে পরিশ্রম ও উৎপাদন খরচ কম অথচ লাভ বেশী।

অপরদিকে, এতে অসুবিধা বা ক্ষতির দিকও রয়েছে। প্রথমত, জুম চাষ অনেকটা সেকেলে হয়ে গেছে। অনুন্নত উৎপাদন পদ্ধতি অনুন্নত সমাজ ব্যবস্থাকে ঠিকিয়ে রাখে। আর অনুন্নত সমাজ উন্নত সমাজের সাথে প্রতিযোগিতায় ঠিকে থাকতে পারে না। যে জাতি উৎপাদনের ক্ষেত্রে যতবেশী অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে সে জাতি ততবেশী উন্নত। দ্বিতীয়ত, এই উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে জড়িয়ে আছে এক ধরনের ভবঘুরে জীবন। মূল বসতি ঠিক থাকলেও প্রতি বছর চাষের জন্য স্থান পরিবর্তন করতে হয়। ফলে স্থায়ী ঘর-বাড়ি, বিভিন্ন ফলজ বাগান করা যায় না। তৃতীয়ত, জুমিয়াদেরকে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকতে হয়। এতে সামাজিক ভিত্তি সুদৃঢ় হয় না, সামাজিক নিয়ম-কানুন ও শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে। চতুর্থত, ছেলেমেয়েরা পড়া-লেখা করার সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। কারণ যেখানে জুম চাষ হয় সেখান থেকে স্কুল অনেক দূরে। পঞ্চমত, ফসল উৎপাদন ভালো হলেও বাজারজাত করা অত্যন্ত কঠিন, শ্রম ও ব্যয়সাধ্য। সর্বোপরি, এতে পরিবেশের ওপর অপরিমেয় ক্ষতি হয়।

বড় মোনে জুম চাষ পরিত্যাগ করে পাড়া-গ্রামে এসে বসতি গড়লে ছেলে-মেয়েরা পড়ালেখা করতে পারবে। শিক্ষা ছাড়া বর্তমানে কেউ উন্নতি করতে পারে না। বড় মোনে অশিক্ষা, রোগ শোক নিয়ে পড়ে থাকার কোন মানে হয় না। তাছাড়া, জুমচাষীদের ভাবতে হবে যে, বড় মোনে জুম চাষের জমি তো একদিন ফুরিয়ে যাবে। কারণ একই জমিতে প্রতিবছর চাষ করা যায় না। এমনকি ভালো ফলনের জন্য অন্তত পক্ষে ১০ - ১২ বছর বিরতি দিতে হয়। এই চাষের জমি ফুরিয়ে গেলে তখন তারা কি করবে? কাজেই জুমচাষীদের উচিত আগাম চিন্তা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যে সব জায়গাজমি খালি, পতিত বা অনাবাদি অবস্থায় রয়েছে সেখানে বসতি গড়ে তোলা ও বিভিন্ন ফলজ বাগান সৃজন করা।

আমার জানা মতে, ইউপিডিএফ ৭ম পাতায় দেখুন

# লোক-সংস্কৃতির ভদ্র-চর্চা

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী/ যায়যায়দিন ১৪ এপ্রিল ২০১০

> **ব্যক্তিগতভাবে কোনো ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলা যদি লোক-সংস্কৃতির চর্চা করতে চান তবে তিনি তা নিশ্চয়ই করবেন, কিন্তু দেশের উপকারের জন্য কোনো আন্দোলন গড়ে তুলতে চাইলেই আমাদের আপত্তি। ব্রতচারী নৃত্য নিজ নিজ গৃহে যিনি যতোখুশি করুন, কিন্তু আমাদের সবাইকে ডেকে যেন বলবেন না, আসুন নৃত্য করি, কেননা তখন আমাদের বলতেই হবে, মাফ করবেন, আমাদের করার মতো আরো অনেক জরুরি কাজ আছে বাকি পড়ে। নকশিকাঁথা তৈরি করবার মতো অখণ্ড অবসর যাদের আছে তারা তা করুন, কিন্তু সবাইকে প্ররোচিত করবেন না ওই কাজে, কেননা আমাদের দরকার হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ শীতবস্ত্র, একটি-দুটিতে কুলাবে না।**

কথাটা স্পষ্ট করে বলে নেয়া যাক : আমি লোক-সংস্কৃতির ভদ্র-চর্চার বিরোধী। এমনকি আজকের দিনে লোক-সংস্কৃতির বলে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে আলাদা-একটা সংস্কৃতিকে যদি টিকিয়ে রাখার চেষ্টা হয়, তবে তার, সে চেষ্টারও আমি বিরোধিতা করতে চাইবো। সমাজতন্ত্রকে যদি আমরা সত্যি সত্যি লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকি তাহলে ভদ্রলোক এবং ততো বেশি ভদ্র নয় লোক, বা গরিব লোকের মধ্যে ভেদরেখাটাকে কায়েমি করে রাখতে পারে এমন বিভাজনকে সমর্থন করতে পারার কোনো উপায় নেই। সমগ্র দেশজুড়ে মানুষের এক ও অখণ্ড সংস্কৃতি গড়ে তোলাই হবে আমাদের কাম্য। তার মানে অবশ্যই এ নয় যে, বৈচিত্র্য থাকবে না সংস্কৃতিতে, স্থানের রং এসে লাগবে না তার গায়ে। বৈচিত্র্য অবশ্যই থাকবে, কিন্তু বিভেদ থাকবে না আমরা ও ওরার। ব্যাপারটা হবে বাগানের মতো; জঙ্গলের মতো না-হয়ে।

আমরা যখন লোক-সংস্কৃতির প্রশংসা করি বা বলি যে, চর্চা করতে হবে লোক-সংস্কৃতির, তখন আমরা ও ওরার পার্থক্যটাকে পাকাপোক্ত করে রাখবার ইচ্ছাটাই ব্যক্ত করি– সে জ্ঞাতসারেই হোক, কি হোক অজ্ঞাতসারেই। আমরা চাই আমরা আমরাই থাকি, তোমরা তোমরাই থাকো। তোমাদের আমরা পিঠ চাপড়ে দেব সময় সময়, তোমাদের মুখের গান গাইব টেলিভিশনে, তোমাদের কাহিনী সংগ্রহ করে এনে জমিয়ে রাখব একাডেমীতে, তোমাদের কাঁথা কি পিঠে এসে সাজিয়ে দেব প্রদর্শনীতে। তোমরা আমাদের গর্ব, তোমরা আমাদের ঐতিহ্য।

এতোই যদি হবে তাহলে আমরা কেন তোমরা হচ্ছি না– এই বিশ্রী প্রশ্নটা কেউ তোলে না। তুললেও কেউ শোনে না, কেউ তার জবাবও দেয় না। আমাদের বাসনাটা থাকে এই যে, তোমরা লাইনের ওপাশেই থাকো, সন্তুষ্টচিত্তে থেকো, কখনো বিদ্রোহ, বিপ্লব বা হাঙ্গামা বাঁধিয়ে তুলো না, তাহলে আমাদের সুখে-স্বস্তিতে বিঘ্ন ঘটবে। আরো একটা অভিলাষ থাকে, খুব গোপনে নয়, থাকে প্রকাশ্যেই। সেটা হলো জীবনের জটিলতা থেকে পালাবার জায়গা পাওয়া। এই কথাটা একজন গবেষক স্পষ্ট করেই বলেছেন দেখলাম তার এক প্রবন্ধে। বলেছেন, আধুনিক জীবন জটিল ও কৃত্রিম, অতএব লোক-সংস্কৃতি আমাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, সেখানে গিয়ে আমরা কোমলতা পাব, পাব মধুরতা। অর্থাৎ যে কারণে লোকে ক্রাইম ফিকশন পড়ে অথবা কখনো-কখনো যায় বনভোজনে, সেই কারণেই চর্চা করব আমরা লোক-সংস্কৃতির। এছাড়া এ কথাও প্রমাণ করতে চাই আমরা, অন্যদের কাছে এবং নিজেদের কাছেও যে, আমরা সাধারণ লোক নই, আমরা ভদ্রলোক– লোক-সংস্কৃতির আমরা পৃষ্ঠপোষক। সবটা মিলে কারণ একটাই লোক-সংস্কৃতিকে আমরা টিকিয়ে রাখতে চাই ভদ্রলোকদের প্রয়োজনে, সাধারণ মানুষের প্রয়োজন তাতে মেটে যদি ভালো, কিন্তু সে-বিবেচনা মুখ্য নয়, গৌণ।

কিন্তু পিঠ চাপড়ানো আমাদের একার কারবার নয়। আমাদের চেয়েও বেশি ভদ্রলোকেরা আছেন, আছেন প্রতীচ্যদেশীয় ব্যক্তিরা, সাম্রাজ্যবাদীরা, তারা আবার পিঠ চাপড়ে দিচ্ছেন আমাদের। বলেছেন ওই একই কথা। লোক-সংস্কৃতি তোমাদের অমূল্য সম্পদ, ওটাকে ছেড়ো না। বলেছেন ওই একই প্রয়োজনে, আমরা যাতে জেগে না উঠি, উঠে বিদ্রোহ না-করি তাদের সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে। এবং যাতে তারা কালেভদ্রে মানস-ভ্রমণ করতে পারেন এই সংস্কৃতিতে। এককালে তারা বলতেন প্রাচ্য হচ্ছে আধ্যাত্মবাদীদের দেশ, অর্থাৎ মহৎ মানুষদের দেশ, আর তারা, প্রতীচ্যের মানুষেরা, নিরতিশয় বর্বর, তারা অনাধ্যাত্মিক, তারা বস্তুবাদী। কিন্তু সেই কথায় আজ আর তেমন জোর পাওয়া যাচ্ছে না, প্রাচ্যের মানুষেরা জেনে ফেলেছে যে আত্মাকে বাঁচাতে হলে দেহকে বাঁচাতে হবে আগে এবং দেহের জন্য বস্তুর প্রয়োজন। পশ্চিমকে এখন তাই নতুন কথা খুঁজতে হচ্ছে বাধ্য হয়ে। লোক-সংস্কৃতির মহিমা প্রচার তাদের খুঁজে পাওয়া নতুন কথা। প্রবীণ কবি সেদিন বলছেন, শুনলাম, ওরা (পশ্চিমারা) আমাদের লোক-সংস্কৃতির কথা শুনলে একেবারে অজ্ঞান। বলাই বাহুল্য, ওরা আমাদের যে জিনিসটা নিয়ে অজ্ঞান তাকে অবশ্যই আমাদের দুর্বলতা জ্ঞান করতে হবে; ওদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এই রকমেরই।

ঠিক তেমনিভাবে আমরা ভদ্রলোকেরা যখন লোক-সংস্কৃতির প্রশংসা শুরু করি, তখন গরিব ও গ্রামের মানুষদের পক্ষে সন্দিগ্ধ ও সতর্ক হওয়া কর্তব্য, কেননা তাদের সঙ্গে আমাদের শ্রেণীগত সম্পর্ক এমন কিছু সৌহার্দ্যের নয়। লোক-সংস্কৃতির মূল্য ও মহিমা বিষয়ে অতিশয়োক্তি তাই মোটেই নিরীহ কোনো ব্যাপার নয়, এর মধ্যে প্ররোচনা, ষড়যন্ত্র, প্রতারণা সব কিছুই রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের এবং আমরা আমাদের দেশের অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর মানুষদের সন্তুষ্ট ও অবদমিত রাখবার জন্যই লোক-সংস্কৃতির ভদ্র-চর্চার বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ করছি– কথাটা মোটামুটি এই রকমই দাঁড়ায়। সাম্রাজ্যবাদ আমাদের মধ্যে নানা ভাবে নানা মুখোশে নানা ফ্রন্টে কাজ করছে এবং তার অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতায় আমরাও জড়িয়ে আছি, অনেকটা স্বার্থগত কারণে, কিছুটা হয়তোবা অজ্ঞাতবসে।

তা হলে কি বলব যে লোক-সংস্কৃতি বলতে কিছু নেই, বা তার কোনো গুণও শুধুই কল্পনা? তার সমাজতাত্ত্বিক মূল্য ও শিল্পমূল্য উভয়ই আছে– যদিও সমাজতাত্ত্বিক মূল্যটাই অধিক, শিল্পগত মূল্যের তুলনায়। লোক-সংস্কৃতি আছে। যেমন আছে আমাদের দারিদ্র্য ও অনগ্রসরতা। থাকবেও ততোদিন যতোদিন আমাদের কিছু অংশকে আমরা 'লোক' বলে চিহ্নিত করে রাখব। সেটা স্বাভাবিকভাবে থাকা, স্বাভাবিক কারণে থাকা। কিন্তু অস্বাভাবিক পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে তাকে টিকিয়ে রাখার কোনো আবশ্যক নেই, টিকিয়ে রাখার অর্থ হবে মানুষের অগ্রগামিতাকে বাধা দেয়া, দরিদ্র মানুষকে দারিদ্র্যের মধ্যেই চিরস্থায়ী করে আটকে রাখা। আর এর পরিহাসটা এখানে যে কাজটা যদিও সাধারণ মানুষের সঙ্গে শত্রুতামূলক তথাপি ভান করছি যে, এর উদ্দেশ্য লোকহিতৈষণা।

লোক-সংস্কৃতির মধ্যে গুণ নিশ্চয়ই আছে। সে বিষয়ে লোক-সংস্কৃতির গবেষক ও পৃষ্ঠপোষকেরা আমাদের অবহিত রেখেছেন। প্রতিনিয়ত রাখছেন। কিন্তু আমাদের লোক-সংস্কৃতির ভেতরে যে মনটি আছে তার পরিচয় নিতে গেলে বলতেই হবে যে, এই মন একাধারে সঙ্কীর্ণ ও স্থবির। আমাদের লোক-জীবন দরিদ্র ও সামান্য, তাই আমাদের লোক-সংস্কৃতির মধ্যে আছে দারিদ্র্য, আছে সামান্যতা। আমাদের রূপকথা, কেচ্ছাকাহিনী ও পুঁথির (পাকিস্তানি আমলে যাকে বলা হতো অত্যুৎকৃষ্ট সাহিত্য) মধ্যে বড় রকমের ছেলেমানুষি রয়েছে। থাকবেই। এরা হচ্ছে সমাজের বাল্যকালে তৈরি। কিন্তু সেই ছেলেমানুষিকে সভ্যতার অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন বলে বিবেচনা করলে তার দ্বারা বয়স্কদের বয়স সম্মানিত হয় না। এইসব সৃষ্টির মধ্যে সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে ভূতপ্রেত ও রাক্ষস-খোক্কসের, পাওয়া যাবে থুরথুরে বুড়ির, সাপের ও বাঘের। দেখা যাবে সেখানে অভাব সব কিছুর, চালের, লাকড়ির, তেলের, চিনির। দেখা হবে বন্ধ্যা নারীর সঙ্গে, হবে অঙ্গুষ্ঠ কুমারের সঙ্গে। সবকিছু মিলিয়ে এই জগৎ অতিশয় ক্ষুদ্র-ভীষণভাবে স্বাস্থ্যহীন, অত্যন্ত অনুজ্জ্বল। এটা একটা ভীতির জগৎ, বেদনার জগৎ। এখানে বীর আছে কিন্তু বীরত্ব নেই। এর সবচেয়ে ভয়াবহ যে রাক্ষস তার প্রাণ-ভোমরা লুকানো আছে ছোট্ট একটি কৌটায়, তাকে হত্যা করতে হলে যুদ্ধের আবশ্যক নেই, ওই ভোমরাটিকে দুহাতে পিষে ফেলতে পারলেই কার্যোদ্ধার হয়। এখানে, এই জগতে, মানুষ ও পশু-পাখিতে কোনো ভেদাভেদ নেই, তারা একই স্তরের প্রাণী, একই পর্যায়ে তাদের সকলের সহাবস্থান। যে-রাজকন্যার প্রাণ আটকা আছে একজোড় কাঠির এপাশ-ওপাশ করার মধ্যে, সেই প্রাণের মতোই ক্ষীণ ও ভীরু এই জগতের প্রাণ। এ শুধু টিকে আছে কোনোমতে, থাকা না-থাকার প্রান্ত ঘেঁষে।

আমাদের লোক-সংস্কৃতিতে নৃত্য খুব একটা নেই, যেটুকু, বা যতোটুকু আছে তার গা-ভরা স্থূলতা। গানই এই সংস্কৃতির প্রধানতম সম্পদ। এই গানের মধ্যে আর্ত মানুষের স্বর আছে, আছে চিরন্তনতা ও সর্বজনীনতা। কিন্তু গানের সামান্যতার দিকগুলোও অবজ্ঞা করবার মতো নয়। এই গান মূলত ব্যক্তিকেন্দ্রিক। আমাদের সমাজে মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতার সুপ্রাচীন গভীরতা নিজেকে প্রকাশ করেছে লোকসঙ্গীতের ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার মধ্য দিয়ে। গানের মধ্যে কোথাও কোথাও মরমীবাদ আছে, আছে আধ্যাত্মিকতা; কিন্তু যাই হোক সব কিছুকে জড়িয়ে আছে স্থূলতা ও দেহকেন্দ্রিকতা। না বলে উপায় নেই যে, আমাদের আধ্যাত্মিকতা আসলেই নিতান্তই বস্তুতান্ত্রিক, এর খানিকটা এসেছে পরকালের লোভ থেকে, খানিকটা ইহকালের ভয় থেকে।

মৈমনসিংহ গীতিকার মানবিক আবেদন বহুল-প্রশংসিত, কিন্তু নদের চাঁদ এমন-কিছু অসাধারণ মানুষ নয়, তার নিজের জীবন, তার আশপাশের জীবন অতিশয় দীন, নিতান্তই সামান্য। তদুপরি এই ঘটনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যে দীনেশ চন্দ্র সেন যখন ময়মনসিংহ গীতকাসমূহ ভদ্রসমাজে উপস্থিত করেছেন তখন তাদের মেজে-ঘষে সাজিয়ে-গুছিয়ে ভদ্র করে নিয়েছেন, গ্রামীণকে তার নিজের স্বাভাবিকরূপে আসতে দিতে ভরসা পাননি। মেওয়া সুন্দরীর মহুয়া হওয়া শুধু নাম বদল নয়, নিজের দীনতা স্বীকারও বটে। বস্তুত লোক-সংস্কৃতি আমাদের কাছে এমনভাবেই সাজগোজ করে, গ্রহণযোগ্য হয়ে তবে আসে। আমাদের বেশিরভাগ গান আমাদের একতারার মতোই ক্ষীণ-প্রাণ। আমরা যে থেকে থেকে কারণে-অকারণে গান গাইতে ভালোবাসি তার মধ্যে যে ভাবালুতা ও অন্যমনস্কতা প্রকাশ পায় তা বড় সৃষ্টির কাজে সহায়তা দান করে না। অধিক কোমলতা অবশ্যই দুর্বলতা। তার ওপরে আছে লোক-সংস্কৃতির বৈচিত্র্যহীনতা এবং সর্বোপরি এর স্থবিরতা। এই সংস্কৃতির মধ্যে বিকাশশীলতা নেই, নেই অগ্রসরমানতা। আমাদের লোক-সংস্কৃতি হচ্ছে একটি অতিদরিদ্র ও স্তব্ধগতি সমাজের সংস্কৃতি। পার্ল বাক তার 'দি গুড আর্থ' উপন্যাসে কৃষকের যে জীবন চিত্রিত করেছেন সেই জীবনের সঙ্গে বাংলাদেশের কৃষকের জীবনের তুলনা করলে বোঝা যাবে এর দারিদ্র্যটা কেমন, স্থবিরতা কতোটা। ওয়াং লাং দরিদ্র কৃষক, সে তার জমিকে ভালোবাসে তেমনি করে, যেমন করে গফুর ভালোবাসত তার মহেশকে। কিন্তু গফুরের তো মহেশ ভিন্ন আর কিছু সম্পদ বা সম্পত্তি নেই। মহেশের জীবন ও গফুরের নিজের একই স্তরের জীবন; ওদিকে ওয়াং লাংয়ের জীবনে দারিদ্র্য যেমন আছে, তেমনি আছে জমি কেনার সুযোগ ও সম্ভাবনা, আছে গৃহযুদ্ধ ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা– বাংলাদেশের কৃষকের জীবনে যার কোনোটাই নেই।

আমাদের লোক-সংস্কৃতির মধ্যে সংরক্ষিত মন ও মানসিকতা তাই আমাদের জাগতিক অগ্রগতির পক্ষে আদৌ সহায়ক নয়, বরং সেই অগ্রগতির পরিপন্থী। ধর্মকে আফিম বলা হয়েছে, লোক-সংস্কৃতিও আফিম হয়ে পড়তে পারে।

এই সংস্কৃতিকেই যখন আমরা আমাদের সম্পদ বলে আস্ফালন করি তখন যে শুধু সাধারণ মানুষের সঙ্গেই শত্রুতা করি তাই নয়, শত্রুতা করি নিজেদের সঙ্গেও। দুর্বলতাকে সবলতা বলে আঁকড়ে ধরার মধ্যে আত্মশত্রুতাই প্রকাশ পায়। লোক-সংস্কৃতির ভেতর আমাদের সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয় নিহিত আছে এ কথা অবশ্যই সত্য, কিন্তু যে সত্যটা বাস্তবিক, তাকে নিয়ে উল্লসিত হওয়ার মতো কিছু নেই, তাকে নিয়ে আত্মতৃপ্ত থাকা তো রীতিমতো অপরাধ।

লোক-সংস্কৃতির জাতীয়তাবাদ যে-অহমিকার জন্ম দিতে পারে তা হবে আত্মঘাতী। আমাদের অনেককালের অন্ধকার নিজেকে জমা রেখেছে আমাদের লোক-সংস্কৃতির অভ্যন্তরে। সেই অন্ধকার ছিন্নভিন্ন করে এগিয়ে যাওয়াই আজ কর্তব্য। এই সংস্কৃতি নিয়ে যখন আমরা গবেষণা করব তখন লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে এই প্রয়োজনের কথাটা যেন কখনো না ভুলি, গবেষণা যেন প্রয়োজনকে, উদ্দেশ্যকে ছাপিয়ে না ওঠে, আর এও যেন আমরা মনে না করি যে, আমাদের পরিচয় সমস্তটাই লুকানো আছে লোক-সংস্কৃতির অন্তরে। আত্মপরিচয় বরং আরো বেশি পাওয়া যাবে অর্থনৈতিক সংগঠনে ও সামাজিক বিন্যাসে। লোক-সংস্কৃতি থেকে লোকেরা যে আনন্দ পায় ও পাবে এই সংবাদও অভ্রান্ত, কিন্তু তার মানে অবশ্যই এ নয় যে, এই আনন্দই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম আনন্দ, এর বাইরে অন্য কোনো আনন্দ নেই। মজা খালে ডিঙ্গি ঠেলে খুব আনন্দ পাচ্ছি এমন কথা বলি আপত্তি নেই, কিন্তু তাই বলে বড় নদী বলে কিছু নেই দুনিয়াতে, বা ডিঙ্গির চেয়ে দ্রুত কোনো যান নেই কোথাও, বা বড় নদীর বড় যানের যাত্রীরা কোনো আনন্দ পায় না সমুদ্র-যাত্রায়, এইসব কথা বলতে যাওয়া আত্মপ্রবঞ্চনামূলক হবে।

লোক-সংস্কৃতির নব-রূপায়ণের কথা বলা হয়েছে এবং আশঙ্কা করছি আরো হবে ভবিষ্যতে। কিন্তু এর অর্থটা পরিষ্কার বোঝা যায় না। লোক-সংস্কৃতির কাহিনী, শব্দ, উপমা, চিত্রকল্প বা অন্য কোনো উপাদানকে যদি আমরা আমাদের নতুন প্রয়োজনে ব্যবহার করি তবে তাকে কি লোক-সংস্কৃতিক নব-রূপায়ন বলা সঙ্গত হবে? নিশ্চয়ই নয়। বহুবিচিত্র লোককাহিনীর ব্যবহার আছে হোমারের 'অডিসি'তে কিন্তু যে-সৃষ্টি এই সাহিত্যকর্ম তা লোককাহিনী নয়, তা মহাকাব্য। শেকসপিয়রের 'কিং লিয়র' নাটকের কাহিনী অনেক দেশের লোককাহিনীতে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু আমরা কি বলবো যে শেকসপিয়র লোককাহিনীর নব-রূপায়ণ সাধন করেছেন, নাকি বলব শেকসপিয়র একটি নাটক লিখেছেন যার কাহিনীর কিছুটা হয়তো লোককাহিনী

৭ম পাতায় দেখুন

## বাংলাদেশ সংবিধান ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অধিকার

৪র্থ পাতার পর

মুহাম্মদ এরশাদ কয়েক লক্ষ হতদরিদ্র বাঙালিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে জোরপূর্বক বসতিস্থাপনের উদ্যোগ নিলে সশস্ত্র সংগঠন শান্তিবাহিনী তার বিরোধীতা করে। শান্তিবাহিনীর হামলায় সে সময় বহু বাঙালি প্রাণ হারান। দুই দশক ব্যাপী এই বৃথা রক্তক্ষয় ও সংঘাত অবশ্যই এড়ানো যেত, যদি তৎকালীন দেশের কর্ণধাররা এ বিষয়ে যথাযথ মনোযোগ দিতেন।

বর্তমানে এই ঐতিহাসিক ভুল সংশোধনের সুযোগ আমাদের সামনে নতুনভাবে উপস্থিত হয়েছে। সংশোধিত সংবিধানে যাতে অতীতের ভুলের পুনরাবৃত্তি না হয় আমরা সেটাই আশা করব। অতীতের ওপর আমাদের কোন হাত নেই। অতীতকে আমরা সংশোধন করতে পারি না। কিন্তু অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা বর্তমানে ভুল এড়াতে পারি। সংবিধানে ক্ষুদ্র জাতিগুলোকে তাদের ন্যায্য অধিকার দিয়ে বাংলাদেশকে তার ঐতিহাসিক দায় থেকে মুক্তি দেয়ার সময় এসেছে। যদি সেটা করতে আমরা ব্যর্থ হই তাহলে তার জন্য ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করবে না। কারণ বাংলাদেশ যদি ক্ষুদ্র জাতিগুলোকে মুক্তি না দেয়, তাহলে বাংলাদেশ নিজেও মুক্ত হতে পারবে না।

## বড় মোনে জুমচাষ বন্ধ করতে হবে

৫ম পাতার পর

গত ৮-১০ বছর ধরে বড় মোনে জুম চাষ না করতে জুম চাষীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে আসছে। পার্টির এ কর্মসূচীর প্রতি আমি জোরালো সমর্থন জানাই। তবে এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য মূলতঃ জনগণকে বুঝিয়ে বলার পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। পার্টির উচিত হবে হরিতকি (উজ্যাল), বহেরা (বড়াগুলো) ও আমলকি (কাদামলা-অমলদি) গাছ কাটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা। এ ধরনের ওষধি গাছ কাটলে শাস্তির ব্যবস্থা থাকা উচিত। অপরদিকে, পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিবেশের সাথে খাপ খায় না এমন গাছ যেমন সেগুন, একাশিয়া, বেলজিয়াম, রাবার ইত্যাদি লাগানো অনুৎসাহিত করা উচিত। কারণ এসব গাছের বাগান করলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয় ও ভূগর্ভস্থ পানির স্তর কমে যায়।

বড় মোনে জুম চাষ ও বাণিজ্যিকভাবে গাছ কাটার ফলে প্রাকৃতিক বন উজার হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে প্রাণ ও জীব বৈচিত্র্য নষ্ট হচ্ছে। ইতিমধ্যে বহু বন্য প্রাণীর অস্তিত্ব হয় হারিয়ে গেছে নতুবা হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। হাতির বিচরণ ক্ষেত্র কমে যাওয়ায় তাদের খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। ফলে তারা খাদ্যের সন্ধানে লোকালয়ে প্রবেশ করছে ও ফসলের ক্ষেত ও মানুষের ওপর চড়াও হচ্ছে। অথচ বেঁচে থাকার অধিকার মানুষের মতো হাতিসহ অন্য সকল প্রাণীরও রয়েছে। আমরা তাদের সেই অধিকার রক্ষা করতে পারছি না। বড় মোনে জুম চাষ বন্ধ হলে বন কিছুটা হলেও রক্ষা পাবে। রক্ষা পাবে বন্য প্রাণীও। মানুষ, বন ও বন্য প্রাণীর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা দরকার।

বাংলাদেশ সরকারেরও উচিত প্রাকৃতিক পরিবেশ তথা বন, বনজ সম্পদ ও বন্য প্রাণী রক্ষার স্বার্থে বড় মোনে (পাহাড়ে) জুম চাষ বন্ধে এগিয়ে আসা। এ জন্য প্রথমত প্রয়োজন জুম চাষীদের সংখ্যা নিরুপন করে তাদেরকে পুনর্বাসনের জন্য পদক্ষেপ নেয়া। বড় মোন রক্ষার জন্য আরো যা করা দরকার তা হলো যত্র তত্র রাস্তাঘাট না করা। যেদিকেই পাকা রাস্তা করা হয়েছে দেখা গেছে সেদিকে বনাঞ্চল উজার হয়েছে। সাজেক রাস্তা হওয়ার পর এই ভ্যালির রিজার্ভ ফরেস্টও এখন প্রায় নিঃশেষ হতে চলেছে। অথচ কয়েক বছর আগেও এখানে গভীর বনাঞ্চল ছিল। আমাদের তথ্য মতে, সেনাবাহিনী পালছড়ি থেকে পূর্বদিকে বাবুছড়া এবং বাবুছড়া থেকে নারেইছড়ি পর্যন্ত রাস্তা করার পরিকল্পনা করছে। এটা বাস্তবায়ন হলে সেদিকের বনাঞ্চলও আর রক্ষা পাবে না। রাস্তাঘাটের মতো বিষয়গুলো কেবল সামরিক ও বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা ঠিক নয়। বিশেষত পার্বত্য চট্টগ্রামের বেলায় এ কথা বেশী প্রযোজ্য। এ কথা স্বীকার করতে হবে যে পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিকায়ন, সমতলবাসীদের বসতিস্থাপন ও বাণিজ্যিকীকরণের সাথে বনজ সম্পদ উজার হওয়ার ব্যাপারটির ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে।

## লোক-সংস্কৃতির ভদ্র-চর্চা

৬ষ্ঠ পাতার পর

থেকে এসেছে, যেমন তার কোনো কোনো কাহিনী এসেছে ইতিহাস থেকে? রবীন্দ্রনাথ যদি বাউল গানের সুর ব্যবহার করেন তার নিজের রচনায় তবে কি সেই রচনার পরিচয় হবে বাউলধর্মী বলে, নাকি রবীন্দ্রধর্মী বলেই তাকে জানতে হবে আমাদের? ফ্রয়েড মানুষের একটি মানসিক জটিলতার নাম দিয়েছেন 'ইডিপাস কমপ্লেক্স' তার অর্থ কি এই যে, ফ্রয়েড ইডিপাসের কাহিনীর নব রূপায়ণ সাধন করেছেন? অনুরূপভাবে মাইকেল মধুসূদন যখন রামায়ণের কাহিনী ব্যবহার করে মহাকাব্য রচনা করেন, তখন রামায়ণের প্রয়োজনে তা করেন না, করেন নিজের প্রয়োজনে। প্রয়োজনটাই কথা। উপাদান দিয়ে নতুন সৃষ্টির পরিচয় হয় না, পরিচয় হয় কোন প্রয়োজনে এই উপাদান ব্যবহৃত হচ্ছে, সেই প্রয়োজন দিয়ে। লোক-সংস্কৃতির ভেতরকার মানসিকতাটা পুরনো, তার স্বার্থক নব-রূপায়ণ আদৌ সম্ভবপর নয়, আজকের মানুষ আর পেছনে ফিরে যেতে পারবে না, মানুষের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়, সম্ভব শুনেছি শুধু ভূতের পক্ষে।

অন্যদিকে লোক-সংস্কৃতির নব-রূপায়ণ বলতে যদি বোঝানো হয় রূপকল্পের নব-রূপায়ণ, তবে তো প্রায় কিছুই বলা হলো না। কেননা রূপকল্প বা ফর্ম দিয়ে তো সৃষ্টির পরিচয় নয়, পরিচয় তার অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু দিয়ে। যদি নতুন বিষয়বস্তু ও নতুন মানসিকতা প্রকাশ করার জন্য পুরনো রূপকল্প ব্যবহার করি তবে তাতে নতুন সৃষ্টিই বলতে হবে, পুরনোর নব-রূপায়ন নয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমাদের লোক-সংস্কৃতির রূপকল্পসমূহও তাদের অন্তর্গত বিষয়বস্তুর মতোই সামান্য।

ব্যক্তিগতভাবে কোনো ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলা যদি লোক-সংস্কৃতির চর্চা করতে চান তবে তিনি তা নিশ্চয়ই করবেন, কিন্তু দেশের উপকারের জন্য কোনো আন্দোলন গড়ে তুলতে চাইলেই আমাদের আপত্তি। ব্রতচারী নৃত্য নিজ নিজ গৃহে যিনি যতোখুশি করুন, কিন্তু আমাদের সবাইকে ডেকে হেন বলবেন না, আসুন নৃত্য করি, কেননা তখন আমাদের বলতেই হবে, মাফ করবেন, আমাদের করার মতো আরো অনেক জরুরি কাজ আছে বাকি পড়ে। নকশিকাঁথা তৈরি করবার মতো অখণ্ড অবসর যাদের আছে তারা তা করুন, কিন্তু সবাইকে প্ররোচিত করবেন না ওই কাজে, কেননা আমাদের দরকার হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ শীতবস্ত্র, একটি-দুটিতে কুলাবে না।

তাছাড়া লোক-সংস্কৃতি বড় বেশি উপস্থিত আছে আমাদের ভদ্রজীবনে, আমাদের সমাজনীতি অর্থনীতি রাজনীতিতে, আমাদের উৎসবে-অনুষ্ঠানে, মনে ও মানসিকতায়। সমস্যা তার উজ্জীবনের নয়, সমস্যা তার প্রাণঘাতী শীতল হস্ত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার। মাইকেল মধুসূদন বিদ্রোহী কবি ছিলেন, আজ যখন 'মধুমেলা' নাম দিয়ে গ্রাম্য অনুষ্ঠানের আয়োজন হচ্ছে তার জন্মস্থানে, তখন বুঝতে কষ্ট হয় না শতাব্দীবাহিত গ্রাম্যতা ভীষণ বড় এক প্রতিশোধ নিচ্ছে এই বিদ্রোহীর বিদ্রোহের ওপর। জীবনে সে তার অনাদর করেছে, রেহাই দেয়নি মৃত্যুর পরও। (বাঙালিও জানে সুদখোর কাবুলিওয়ালা হতে) এই গ্রাম্যতার কারণেই আমাদের দেশে বিজ্ঞানী এসেছে, যদিও কিন্তু বিজ্ঞান প্রায় আসতেই পারল না। এর কারণেই আমাদের প্রকৌশলীরা হন তাবলিসী, পদার্থ-বিজ্ঞানীরা হন জ্যায়াতি।

লোক-সংস্কৃতির ভদ্র-চর্চার বিরোধিতা না করে উপায় কী? এই চর্চায় শুধু রক্ষণশীলতা নেই, আছে প্রতিক্রিয়াশীলতা, আছে প্রতারণা, সমূহ অপচয়, একটা বিকটাকার ক্ষতি।

*সৌজন্যে ব্যায়ব্যায়দিন।*

## মানিকছড়ি ও লক্ষীছড়ি এলাকায় বাঙালী কর্তৃক ভূমি বেদখলের চিত্র

শেষ পাতার পর

দখলীয় চার একর পাহাড় ২০০৭ সালে মোঃ আমিরা সাং- গচ্ছাবিল শুচ্ছগ্রাম, মানিকছড়ি কর্তৃক বেদখল হয়।

**লক্ষীছড়ি**

লক্ষীছড়ি উপজেলার ২১৮ নং জুর্গাছড়ি ও ২২০ নং মহুরখীল মৌজার সাঁওতাল পাড়া, ইন্দ্র কার্বারী পাড়া, বান্যাছোলা ও মইসকাবায় সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে সেখানেও সেটলার কর্তৃক পাহাড়িদের প্রচুর জায়গাজমি বেদখল হয়ে গেছে। এলাকাবাসী জানান, এলাকার কিছু ভূমিদস্যু এই বেদখলের সাথে জড়িত। এ ব্যাপারে তারা জেলা প্রশাসকের বরাবরে দেয়া তাদের একখানা দরখাস্তের ফটোকপি এ প্রতিবেদককে দেয়।

সাঁওতাল পাড়ার পবন কার্বারী বলেন, গত বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের আমলে লক্ষীছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রোকন উদ্দৌল্লাহ তাদেরকে সর্বনাশ করে চলে যায়। তাদের পাড়ার বাবুল সাঁওতাল, রিটে সাঁওতাল, শ্রীধান সাঁওতাল এবং ননাইহা সাঁওতালের প্রত্যেকের ৫ একর করে মোট ২০ একর পাহাড় মোঃ রোকন উদ্দৌল্লাহ বেদখল করে। এই বেদখলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে তারা রোকন উদ্দৌল্লাহ কর্তক হয়রানি শিকার হন।

রোকন উদ্দৌল্লাহ সেটলার বাঙালীদের কাছ থেকে জমির ভুয়া দলিল ক্রয় করে সাঁওতালদের দখলীয় এবং বন্দোবস্তীকৃত জায়গা বেদখল করে। বেদখলকৃত জায়গার উপর সে বিদেশী প্রজাতির গাছ যেমন একাশিয়া, বেলজিয়াম ইত্যাদি গাছের বাগান গড়ে তুলেছে। এ বাদে লক্ষীছড়ি উপজেলায় রোকন উদ্দৌল্লাহ'র ৪টির মতো বাগান রয়েছে। জায়গাগুলি বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তার স্ত্রী এবং আত্মীয়ের নামে-বেনামে নেয়া হয়েছে। যেমন ডেবাতলী পাড়ার খোয়াইঅংই মার্মা প্রায় ৫ (পাঁচ) একর পাহাড়ের উপর গামারী গাছের বাগান সৃজন করে। ১৫/১৬ বছর বাগান পরিচর্যা করার পর লক্ষীছড়ি উপজেলার মহুরখীল শুচ্ছগ্রাম থেকে এক সেটলার বাঙালী এসে ঐ বাগানটা তার বলে দাবি করে। এক সময় ঐ বাঙালী আরো ২৪/২৫ জন বাঙালী জুটিয়ে বাগানটা কেটে ফেলার ব্যবস্থা করলে এতে খোয়াইঅং মার্মা প্রতিবাদ করেন এবং লক্ষীছড়ি উপজেলার তৎকালীন নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ রোকন উদ্দৌল্লাহ'র কাছে লিখিত এবং মৌখিকভাবে অভিযোগ করেন। এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে রোকন উদ্দৌল্লাহ একদিন খোয়াইঅংরুই মার্মার বাগান তদন্ত করতে যায়। তার সাথে এলাকার কয়েকজন মুরুব্বীও ছিল। এর কয়েকদিন পর রোকন উদ্দৌল্লাহ তার বাসায় আসার জন্য খোয়াইঅংরুই মার্মাকে খবর দিলে খোয়াইঅংরুই মার্মা রোকনউদ্দৌল্লাহ'র বাসায় উপস্থিত হন। এ সময় রোকনউদ্দৌল্লাহ খোয়াইঅংরুই মার্মাকে বলেন যে, "তোমাকে আমি দেখবো, প্রয়োজনে একটা চাকুরীর ব্যবস্থা করে দেবো। তুমি ঝামেলায় যেও না। বাগানটা আমাকে দিয়ে দাও। আমি তোমাকে এক লক্ষ টাকা দেবো। এ জায়গাটা তোমার নয়। প্রকৃত বিচারে তুমি জায়গা পাবে না। তোমার কোন দলিলপত্র নেই। আর অন্যদিকে বাঙালীর দলিলপত্র রয়েছে। আপোষের মাধ্যমে বোঝাপড়া করলে তোমার জন্য ভালো হবে।"

রোকনউদ্দৌল্লাহ লক্ষীছড়ি থেকে বদলী হয়ে রাজধানী ঢাকায় ভেজাল বিরোধী অভিযানে নেতৃত্ব দিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করলেও পবন কার্বারী বলেন, রোকনউদ্দৌল্লাহ নিজেই একজন ভেজাল লোক। তিনি কিভাবে ঐ দায়িত্ব পেলেন বুঝি না।

এলাকাবাসীর দেয়া তথ্য মতে, লক্ষীছড়ির জুর্গাছড়ি, মহুলখীল, দুল্যাতলী, জারুলছড়ি মৌজার ৮২ জন পাহাড়ি ও সাঁওতালের কয়েক শ একর জমি সেটলার কর্তৃক বেদখল হয়েছে। এর মধ্যে শ্মশানের জমিও রয়েছে। বেদখলকারী সেটলাররা মহুরখীল শুচ্ছগ্রাম, মগাইছড়ি শুচ্ছগ্রাম, মোছকাবা শুচ্ছগ্রাম ও লক্ষীছড়ি সদর এলাকার বাসিন্দা।

**মাইজভান্ডারের নামে জমি বেদখলের চেষ্টা**

লক্ষীছড়ি উপজেলার ১নং লক্ষীছড়ি সদর ইউনিয়নের হলুধ্যা পাড়ার লিচাইপ্রু মার্মা এ প্রতিবেদককে বলেন, "আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার সাথে সাথে হলুধ্যা পাড়া, দুধ্যা পাড়া, রুকছড়ি পাড়ার দখলীয় জায়গায় সৃজিত গাছ ও বাঁশের বাগানগুলি খাস জায়গা উল্লেখ করে "মাইজ ভান্ডার" (ডাঃ সৈয়দ দিদারুল হক)-এর নামে ৮৩ নং ধুরুং মৌজার ৮৫০ একর জায়গা (খতিয়ান নং-১) লিজ দেয়ার চেষ্টা চলছে। তবে পাড়াবাসী এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ জানায় ও প্রতিরোধ গড়ে তুলে। লক্ষীছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কক্ষে এ ব্যাপারে এক শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। শুনানীতে নির্বাহী কর্মকর্তা মাইজ ভান্ডারের পক্ষ হয়ে আমাদের জায়গাগুলি মাইজভান্ডারকে দেয়ার জন্য এলাকাবাসীকে অনুরোধ করেন (রায় ছাড়া)। নির্বাহী কর্মকর্তার বক্তব্য হচ্ছে জায়গাগুলি মাইজ ভান্ডারকে দেয়া হলে এলাকার উন্নয়ন হবে। রাস্তাঘাট হবে। বিদ্যুৎ আসবে। বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান হবে ইত্যাদি। এ সময় শুনানীতে উপস্থিত এলাকাবাসী এর তীব্র প্রতিবাদ জানায়।"

এ ব্যাপারে ৮৩ নং ধুরুং মৌজার হেডম্যানের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিষয়টি সত্য বলে স্বীকার করেন। তিনি উপজেলা ভূমি অফিস থেকে তাকে দেয়া ১টি নোটিশের ফটোকপিও এ প্রতিবেদককে দেন।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার সাথে সাথে আনিসুল রহমান নামে বহিরাগত এক ব্যবসায়ী দুল্যাতলী ইউনিয়নের মগাইছড়ি এলাকার সেটলার বাঙালীদের কাছ থেকে ভুয়া কবুলিয়ত (নকল দলিল) ক্রয় করে এবং বর্তমানে পাহাড়িদের দখলীয় পাহাড় বেদখলের জন্য ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। গত বছর আনিসুল কিছু পাহাড় বেদখল করে ফলজ গাছ লাগালে এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে তার লাগানো গাছের চারা নষ্ট করে দেয়।

লক্ষীছড়ি উপজেলার কুতুকছড়ি ও বটতলী গ্রামের লোকজনের ভাষ্য মতে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হওয়ার সাথে সাথে কর্ণফুলী চা বাগান কর্তৃপক্ষ তাদের বাপ-দাদার আমল হতে ভোগদখল করা জায়গা বেদখলের ষড়যন্ত্র শুরু করে। কর্ণফুলী চা বাগান থেকে জায়গা বেদখল করার জন্য জঙ্গল পরিষ্কার করতে যে সব শ্রমিককে পাঠানো হয় প্রথমে তারা জনগণের কোন বাধা গ্রাহ্য করতে চায় নি। পরে এলাকাবাসী ঐক্যবদ্ধ হয়ে যখন প্রতিরোধ গড়ে তোলে তখনই চা বাগান কর্তৃপক্ষ পিছু হটতে বাধ্য হয়। চা বাগান কর্তৃপক্ষের সাথে এলাকাবাসীর বিরোধ দেখা দেয়ার ফলে লক্ষীছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান রেঙ্গাচাই চৌধুরী এবং লক্ষীছড়ি নির্বাহী কর্মকর্তা সরেজমিনে জায়গাগুলি দেখে কর্ণফুলী চা বাগান কর্তৃপক্ষকে জায়গা বেদখল না করার জন্য নির্দেশ দেন।

এলাকাবাসী উপজেলা চেয়ারম্যানের বরাবরে ১০৪ জনের স্বাক্ষরিত একটি দরখাস্ত দেয়, যার একটি কপি এই প্রতিবেদককে দেয়া হয়।

এভাবে সেটলাররা লক্ষীছড়ি ও মানিকছড়িতে পাহাড়িদের বাপ-দাদার আমল হতে ভোগদখলকৃত জায়গা-জমি নকল দলিলের মাধ্যমে বেদখল করছে। অন্যদিকে শাসক গোষ্ঠি, সেনা, আমলা, ব্যবসায়ী ও কোম্পানীর লোকজন উন্নয়নের নামে জায়গা বেদখল করে পাহাড়িদেরকে নিজ বসতভিটা থেকে চিরদিনের জন্য উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। প্রতিরোধই ভূমি রক্ষার একমাত্র হাতিয়ার।

# মানিকছড়ি ও লক্ষীছড়ি এলাকায় বাঙালী কর্তৃক ভূমি বেদখলের চিত্র

॥ অংসোচিং, ৩০ জুন ২০১০ ॥

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মানিকছড়ি এবং লক্ষীছড়ি উপজেলায় বিগত বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের আমল থেকে শুরু হওয়া ভূমি বেদখল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে অব্যাহত থাকে, এবং এমনকি বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেও অব্যাহত আছে। সংঘবদ্ধ কিছু ভূমি দস্যু এই এলাকার পাহাড়ি জনগণের শত শত একর ভূমি বেদখল করে নিচ্ছে।

ইদানিং ভূমি দস্যুদের দখলবাজি এমনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যে, পাহাড়িদের শ্মশান, বৌদ্ধ বিহারের জায়গা, বসতভিটা, দখলীয় এবং বন্দোবস্তীকৃত জমি পর্যন্ত বাদ যাচ্ছে না। পুরোন বস্তি বাঙালীদের অনেকেই ভূমি দস্যুদের কবলে পড়ে জমি হারিয়েছেন। এসব ভূমি দস্যুরা সরকারী উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে বিভিন্ন কৌশলে নকল দলিল বানিয়ে ভূমি বেদখল করে থাকে। একদিকে সেটলার বাঙালী কর্তৃক পাহাড়িদের ভূমি বেদখল করা হচ্ছে, অন্যদিকে ভূমি দস্যুদের মাধ্যমে সরকারী কর্মচারী, সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা এবং বহিরাগত বড় বড় ব্যবসায়ী, কোম্পানী ভূমি বেদখল প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত রয়েছে। যেসব এলাকায় ভূমি বেদখল হয়ে গেছে সেসব এলাকায় সরেজমিন তদন্তে গেলে এলাকাবাসী এ প্রতিবেদককে জানান, কিছু ভূমি দস্যু কর্তৃক এলাকার শত শত একর জায়গা ইতিমধ্যে বেদখল হয়ে যাচ্ছে।

**ভূমি দস্যুদের কয়েকজন**

এলাকাবাসীর সাথে আলোচনায় কয়েকজন ভূমি দস্যুর নাম উঠে এসেছে। এরা হলো খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি এলাকার তিনটহরী গুচ্ছগ্রামের বাসিন্দা মোঃ মতিন, পীং- মৃত খোরশেদ আলী ভূঁইয়া, ও তার তিন ভাই মোঃ মোশারফ, মোঃ ফয়েজ মিস্ত্রি ও মোঃ গোলাম মণ্ডল (চৌধুরী) এবং মোঃ মনসু।

ভূমি বেদখল সম্পর্কে কুমারী পাড়ার বরেন্দ্র কার্বারী এবং আরেশে মারমা নিম্নোক্ত তথ্য প্রদান করেন:

**এক**। গত বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের আমলে সন্তোষ বড়ুয়া নামে এক পুলিশ অফিসার মানিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে উপরোল্লেখিত ভূমি দস্যুদের মাধ্যমে মানিকছড়ি উপজেলার ২২৪ নং কুমারী মৌজার কুমারী পাড়ায় অংজ মারমার প্রায় ৫ একর পাহাড়, সাইন্দাউ মগিনী, স্বামী- থোয়াইপ্রু মগের ৫ একর পাহাড়, রুইম্রোচাই মগ, পীং- চাইহ্লাপ্রু মগের ৫ একর পাহাড়, থোয়াইরুই মগ, স্বামী- রুইম্রোচাই মগদের ৫ একর পাহাড় -- সব মিলিয়ে মোট ২০ (বিশ) একর পাহাড় দখল নিয়ে সেখানে হাইব্রীড জাতীয় একাশিয়া, বেলজিয়াম (বিরাশি) গাছ লাগায়। উক্ত জমি ওসি সন্তোষ বড়ুয়া তার স্ত্রী এবং আত্মীয়দের নামে নকল দলিলের মাধ্যমে বেদখল করে।

**দুই**। এডিসি মোঃ জাফর আলম (চট্টগ্রাম) গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে জরুরী অবস্থার মধ্যে ভূমি দস্যুদের মাধ্যমে মানিকছড়ি উপজেলার ২২৪ নং কুমারী মৌজাধীন কুমারী পাড়ার অংসাইন মগের প্রায় ১০ (দশ) একর পাহাড়, উসাইন্দা মগিনী, হেমন্ত্র ত্রিপুরা, ও সুরেন্দ্র ত্রিপুরার ১০ (দশ) একর পাহাড়, রুইশিহ্লা মগের ১০ একর পাহাড় মোট ৩০ (ত্রিশ) একর পাহাড় নকল দলিলের মাধ্যমে দখল করে হাইব্রীড জাতীয় একাশিয়া ও বেলজিয়াম গাছ লাগায়।

**তিন**। সচিব মোঃ মনিরুল ইসলাম (পিতার নাম কাজী সিরাজুল ইসলাম) জরুরী অবস্থার সময় ভূমি দস্যুদের মাধ্যমে মানিকছড়ি উপজেলার ২২৪ নং কুমারী মৌজার কুমারী পাড়ার অংসাই মগের প্রায় ৩০ (ত্রিশ) একরের মতো দখলীয় এবং বন্দোবস্তিকৃত পাহাড় নকল দলিলের মাধ্যমে বেদখল করে। মোঃ মনিরুল ইসলাম দখল করা পাহাড়ি জমিতে ভূমি দস্যু মোঃ মতিনকে দিয়ে একাশিয়া ও বেলজিয়াম গাছের বাগান সৃজন করে।

**চার**। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে জরুরী অবস্থার মধ্যে ২২৪নং কুমারী মৌজায় ভূমি দস্যুদের মাধ্যমে মোঃ হারুন রশীদ নামে ফটিকছড়ির জনৈক ব্যবসায়ী ৫ (পাঁচ) একর, একই এলাকার মোঃ মিজান উদ্দীন ৫ (পাঁচ) একর ও মোঃ তাজুল ডিলার (চেয়ারম্যান) ১০ (দশ) একর মোট ২০ একরের মতো পাহাড় এভাবে ভূমি দস্যু মতিনের মাধ্যমে একাশিয়া গাছ লাগিয়ে বেদখল করে।

কুমারী এলাকায় নকল দলিলের মাধ্যমে গাজী ট্যাঙ্ক কোম্পানী এবং সেলিমের মতো বড় বড় শিল্পপতিরা ভূমি দস্যু মতিনের মাধ্যমে শত শত একর পাহাড় বেদখল করে বিভিন্ন বিদেশী প্রজাতির গাছ লাগিয়ে বাগান করছে।

মানিকছড়ি সদর ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান মোঃ আজাদ সেটলার বাঙালীদের কাছ থেকে নকল জমি-দলিল ক্রয় করে শত শত একর পাহাড় বেদখল করেছে। এই দলিলগুলো এরশাদ আমলে অবৈধভাবে দেয়া হয়েছিল, যা কবুলিয়ত নামে পরিচিত। ব্যাপক হারে বিদেশী প্রজাতির গাছ লাগানের ফলে এলাকায় প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বরেন্দ্র কার্বারী এবং আরেশে মারমা।

**পাঁচ**। মানিকছড়ি উপজেলার ২২১ নং ম্যপ্রুতলী মৌজার ডেবাতলী পাড়া নিবাসী রিপ্রুচাই মার্মা এবং কংজপ্রুই মার্মার সাথে দেখা হলে তারা জানান, তাদের দুই জনের প্রায় ১৫ (পনের) একরের মতো বন্দোবস্তীকৃত পাহাড় নকল দলিলের মাধ্যমে ভূমি দস্যু মোঃ ফয়েজ মিস্ত্রি জোরপূর্বক বেদখল করেছে। এছাড়াও তাদের পাড়ায় গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে মংরে মার্মা, পীং- রুইকিউ মার্মার ৫ একর ও সাথ্য মারমার ৫ (পাঁচ) একর মোট ১০ একর পাহাড় ভূমি-দস্যু মোশারফ কর্তৃক বেদখল হয়। একই পাড়ার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ফকির মহাজনের ৫ একর পাহাড়ও তিনটহরী গুচ্ছগ্রামের মকবুল মিয়া নকল দলিলের মাধ্যমে জোরপূর্বক দখল করে নেয়।

**ছয়**। মানিকছড়ি উপজেলার ২২১ নং ম্যপ্রুতলী মৌজার দাইজ্যা পাড়ার কাজল মার্মা জানান, গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জরুরী অবস্থার মধ্যে বৌদ্ধ বিহারের জায়গাসহ তার প্রায় ৪ (চার) একরের মতো পাহাড় লক্ষীছড়ি উপজেলার ২২০ নং ময়ূরখীল মৌজার জমাদারের ছেলে মোঃ ইয়াকুব জোরপূর্বক বেদখল করে। একই সময়ে দাইজ্যা পাড়ার মার্মাদের শ্মশানের জায়গা এবং অংক মার্মা পীং- ম্রাসাউ মার্মার বন্দোবস্তীকৃত ২য় শ্রেণীর ৬০ শতক জমি মানিকছড়ি উপজেলার তিনটহরী গুচ্ছগ্রামের মোঃ মজনু মিয়া বেদখল করে।

**স্বাধীনতার পর বেদখল শুরু হয়**

২২৪ নং কুমারী মৌজার কুমারী পাড়াবাসীরা জানান, কুমারী এলাকায় ভূমি বেদখলের প্রক্রিয়া অনেক আগে শুরু হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরই সেখানে বাঙালীদের কর্তৃক ভূমি বেদখল শুরু হয়। যেমন : ১৯৭৩ সালে সাধন কুমার দেভাষীর বন্দোবস্তীকৃত ৫ (পাঁচ) একর ১ম শ্রেণীর ধান্য জমি, ১৯৭৪ সালে ক্যথাই মার্মার বন্দোবস্তীকৃত ৩ (তিন) একর ১ম শ্রেণীর জমি, ১৯৭৪ সালে মিসেস্ উম্রইন্দা মগিনীর বন্দোবস্তীকৃত ৫ (পাঁচ) একর ১ম শ্রেণীর ধান্য জমি, ১৯৭৬ সালে নাগর চান চাকমার বন্দোবস্তীকৃত ২ (দুই) একর ১ম শ্রেণীর ধান্য জমি, ১৯৭৮ সালে সাথোয়াইমে মার্মার বন্দোবস্তীকৃত ৫ (পাঁচ) একর ১ম শ্রেণীর ধান্য জমি, ১৯৮৪ সালে বরেন্দ্র কার্বারীর বন্দোবস্তীকৃত ৪ (চার) একর ১ম শ্রেণীর ধান্য জমি, ২০০১ সালে সুরেন্দ্র ত্রিপুরার বন্দোবস্তীকৃত ৫ (পাঁচ) একর ৩য় শ্রেণীর পাহাড়, ২০০৭ সালে সূর্য্য চন্দ্র চাকমার বন্দোবস্তীকৃত ৩ (তিন) একর ১ম শ্রেণীর ধান্যজমি, ২০০৭ সালে রামেন্দ্র মোহন চৌধুরীর বন্দোবস্তীকৃত ১০ (দশ) একর ৩য় শ্রেণী বন্দোবস্তীকৃত পাহাড়, হেমন্ত্র ত্রিপুরার দখলীয় ৫ একর ৩য় শ্রেণীর পাহাড় সেটলার কর্তৃক বেদখল হয়।

এছাড়া ১৯৮০-৮১ সালে হেমন্ত্র ও সুরেন্দ্র ত্রিপুরার বন্দোবস্তীকৃত ৩ (তিন) একর ও কংজপ্রু মার্মার বন্দোবস্তীকৃত ২ (দুই) একর ১ম শ্রেণীর ধান্য জমি তৎকালীন জেলা প্রশাসক বেআইনীভাবে খাস করে নিয়ে রজ্জব নেছার নামে জনৈক সেটলারের নামে বন্দোবস্তী দেয় এবং রেকর্ডপত্র সেভাবে ঠিকঠাক করে।

মৌজা প্রধানদের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা ভূমি বেদখলের সত্যতা স্বীকার করেন। ২০৮ নং মানিকছড়ি মৌজায় মানিকছড়িতে সেটলার বাঙালী, বহিরাগত ব্যবসায়ী এবং কোম্পানী কর্তৃক পাহাড়িদের অনেক জায়গা বেদখল হয়ে গেছে। যাদের ভূমি বেদখল হয়ে গেছে তাদের কয়েকজনের নাম পাওয়া গেছে। এর মধ্যে রুইফাঅং মার্মার দখলীয় ৫ একর তৃতীয় শ্রেণীর পাহাড় ২০০৬ সালে নাজিরহাট নিবাসী মোঃ ইদ্রিস, সাং-নাজিরহাট বেদখল করে। ইদ্রিস বেদখল করা জায়গায় একাশিয়া গাছের বাগান করেছে। স্বপন চাকমার দখলীয় ৫ একর পাহাড়ও একইভাবে ইদ্রিস বেদখল করে একাশিয়া গাছের চারা লাগিয়েছে। এছাড়া বক্রি পাড়ার জয় কুমার চাকমার ৭ম পাতায় দেখুন

## মহালছড়িতে সেটলার কর্তৃক এক পাহাড়ি ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা

*জাতীয় বার্তা রিপোর্ট:* গত ১৫ আগস্ট দুপুর আনুমানিক ১১টার সময় লেমুছড়ি হাই স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী আশা চাকমাকে (১৫) নিজ বাড়িতে লেমুছড়ি গুচ্ছগ্রামের সেটলার মোঃ হযরত আলীর ছেলে মোঃ হারুন আলী ও রহিমুদ্দিন-এর ছেলে মোহর আলী ধর্ষণের প্রচেষ্টা চালায়। এ সময় আশা চাকমা নিজ গ্রাম বদানালার বাড়িতে একা ছিলেন।

হারুন আলী ও মোহর আলী গরু খোঁজার নামে উক্ত গ্রামে গেলে আশা চাকমাকে বাড়িতে একা দেখতে পেয়ে তার কাছ থেকে পানি চায়। আশা চাকমা তাদের পানি দিতে গেলে বাঙালিরা তাকে ঝাপটে ধরে ধর্ষণের প্রচেষ্টা চালায়। এ সময় মেয়েটি চিৎকার দিতে থাকে এবং একজন বাঙালিকে হাতে কামড় দেয়। এতে বাঙালিরা মেয়েটির গালে চড় মারলে মেয়েটির একটি দাঁত ভেঙে যায়। পরে মেয়েটির চিৎকার শুনে আশে-পাশের গ্রামবাসীরা ছুটে আসে। তবে এর মধ্যে বাঙালিরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

ঘটনাটি মহালছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যানকে জানানো হলে মহালছড়ি থানা থেকে পুলিশ ঘটনাস্থলে তদন্ত করতে যায় এবং লেমুছড়ি গুচ্ছগ্রাম থেকে ধর্ষণ প্রচেষ্টাকারী মোহর আলীকে পুলিশ গ্রেফতার করে। তবে তার সঙ্গী হারুন আলীকে পুলিশ এখনো খুঁজে পায়নি বলে জানা গেছে।

আশা চাকমার পিতার নাম জ্ঞান চাকমা, গ্রাম বদনালা (পশ্চিম কিয়াংঘাট), ইউপি- মাইসছড়ি ৯ নং ওয়ার্ড, উপজেলা-মহালছড়ি।

## সাজেকে এক পাহাড়ির জমিতে বেড়া দিয়েছে সেটলার বাঙালিরা

*জাতীয় বার্তা রিপোর্ট:* গত ১৪ আগস্ট বিকেল আনুমানিক ৩টার সময় বাঘাইহাট থেকে ৬/৭ জনের এক দল সেটলার বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নের ভিপু পাড়ার বাসিন্দা চন্দ্রসেন চাকমার ছেলে বহ্নরা চাকমার (৩৫) রোপনকৃত জমির চারপাশে বেড়া দেয়। বেশ কয়েকদিন থেকে সেটলাররা উক্ত জমি বেদখলের চেষ্টা চালাচ্ছিল বলে এলাকাবাসীর অভিযোগে জানা গেছে।

উক্ত ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ও ক্ষোভ বিরাজ করছে।

গত ১৯ - ২০ ফেব্রুয়ারী সাজেকে যে সেটলার হামলা হয় তার মূলে ছিল ভূমি। সেটলাররা সেনাবাহিনীর সহায়তায় সেখানে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে পাহাড়িদের জমি বেদখল করার চেষ্টা চালিয়ে আসছে। সাজেকের ঐ হামলায় চার শতাধিক ঘরবাড়ি পুড়ে যায়।

## পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর উন্নয়ন কার্যক্রম!

গত ৩০ জুন দৈনিক পূর্বকোণে গুইমারার একটা খবর প্রকাশিত হয়েছে। খবরের শিরোনাম: "গুইমারায় বিশুদ্ধ পানির প্ল্যান্ট উদ্বোধন"। এতে বলা হয়েছে: গুইমারা সিন্দুকছড়ি ইউনিয়নের প্রায় ১৫ হাজার পাহাড়ি-বাঙ্গালীদের মাঝে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য গুইমারা রিজিয়নের ৩২ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী গত রবিবার একটি বিশুদ্ধ পানির প্ল্যান্ট তৈরি করে। পানি সরবরাহের কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন গুইমারা রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মির্জা এজাজুর রহমান। উপস্থিত ছিলেন সিন্দুকছড়ি জোন কমান্ডার লেঃ কর্ণেল কামরুল হাসান, উপ-অধিনায়ক মেজর মোয়াজ্জেম, বি.এম মেজর কায়ছারসহ সামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ।"

সেনাবাহিনী তথাকথিত কাউন্টার-ইন্সার্জেন্সির কৌশল হিসেবে উক্ত প্ল্যান্ট উদ্বোধন করলেও তাতে দু'টি বিষয় স্পষ্ট। প্রথমত, চুক্তির এক যুগ পরও পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবহিনীর একাধিপত্য পূর্ববৎ রয়ে গেছে। তাদের কাজ এটা সেটা উদ্বোধন করা নয়, সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় নয়, প্রেস ক্লাবের জন্য ঘর নির্মাণ করে দেয়া নয়; তাদের কাজ হলো দেশ রক্ষা। চুক্তির পর তাদের ঠিকানা হওয়ার কথা ছিল ব্যারাকে। কিন্তু সেখানে তারা এখনো ফিরে যায়নি। চুক্তির আগে তাদের যে দাপট ছিল, এখনো তাই আছে। অপারেশন উত্তরণের অধীনে তারাই কার্যত পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন করছে। সিভিল প্রশাসনকে তাদের অধীনস্থ করে রেখেছে।

দ্বিতীয়ত: এই পানির প্লান্ট উদ্বোধনের মাধ্যমে সবার সামনে স্পষ্ট হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে এ যাবৎ কি করা হয়নি এবং কি করা যেত। তথাকথিত কাউন্টার-ইন্সার্জেন্সির নামে যে কোটি কোটি টাকা অপব্যয় করা হয়, সেই টাকা যদি উন্নয়নের জন্য খরচ করা হতো তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি বাঙালি সবার অর্থনৈতিক অবস্থার অনেক উন্নতি হতো। দারিদ্র্য, অশিক্ষা চিরতরে দূর হতো। অভাব অনটনে দিন কাটাতে হতো না। জনগণের স্বাস্থ্য সেবার মান বেড়ে যেতো।

কিন্তু বিগত দশকগুলোতে সত্যিকার অর্থে উন্নয়ন হয়েছে বলা যায় না। কিছু রাস্তাঘাট হয়েছে, তবে তার ফলে বেশী লাভবান হয়েছে বাঙালি ব্যবসায়ী শ্রেণী। তারা একদিকে যেমন একেবারে গভীরতম বনাঞ্চল থেকে বন ও বনজ সম্পদ আহরণ করতে সক্ষম হচ্ছে; অন্যদিকে, দূর দূরান্তের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত জুমচাষীদের পর্যন্ত বাজার অর্থনীতির আওতায় নিয়ে এসেছে। অর্থাৎ পুঁজিবাদী শোষণের দ্বার অবারিত হয়েছে। এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিত্তশালী শ্রেণীর জন্ম হওয়ার পাশাপাশি বৃহত্তর জনগোষ্ঠির মধ্যে এসেছে দারিদ্র্য, অভাব অনটন।